মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং - ২৭২
১৭শ বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা
জুন ২০১২ ঈসায়ী

তাসাউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

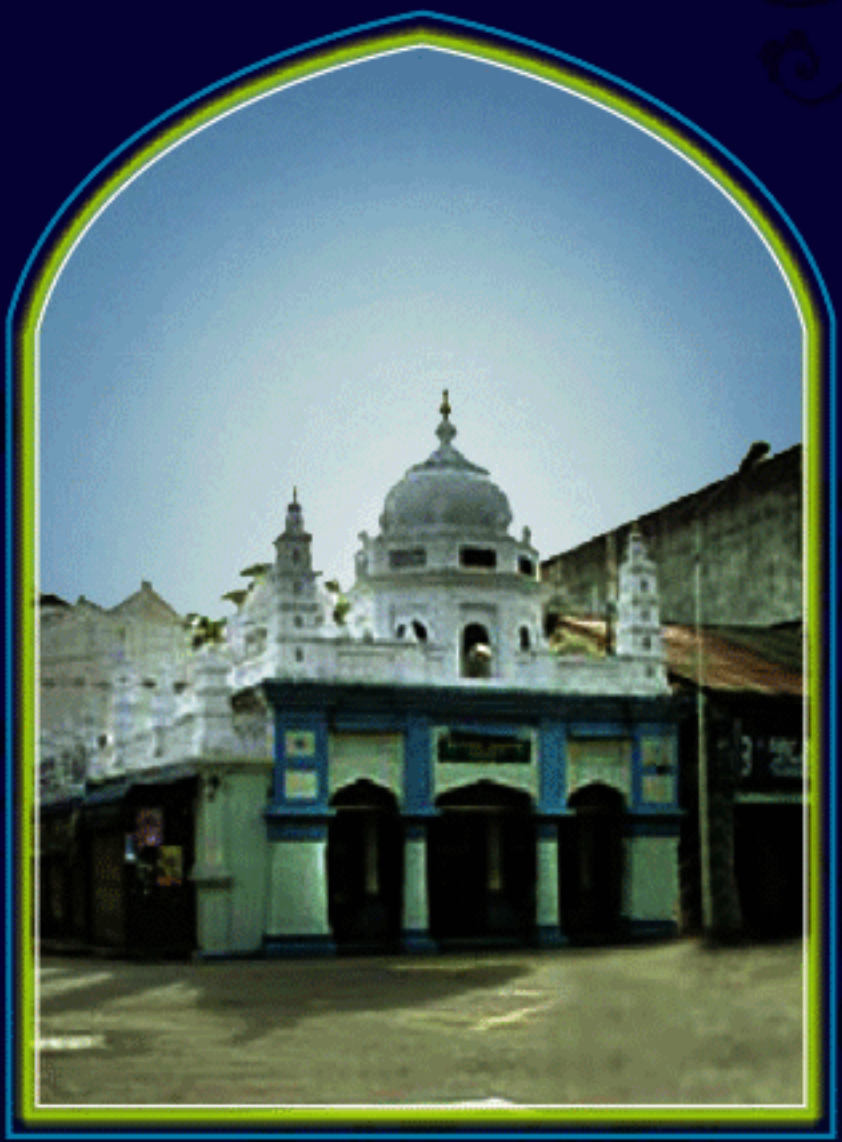

মালয়েশিয়ায় পেনাঙে
হযরত সৈয়দ ছহুল হামিদ (রঃ)-এর রওজা শরীফ

পেনাঙে চুলিয়া সড়কে
হযরত মৌলানা মিসকিন শাহ (রঃ)-এর
মাজার শরীফ

হযরত আলীম শাহ (রঃ)-এর দরগাহ

মালয়েশিয়ার জাতীয়
মসজিদ মসজিদ-এ-নেগারা

মাসিক
আলোকধারা
THE
ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজিঃ নং ২৭২, ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
জুন ২০১২ ঈসায়ী
রজব-শাবান ১৪৩৩ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪১৮ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক
মোঃ মাহবুব উল আলম

যোগাযোগঃ
লেখা সংক্রান্তঃ ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্তঃ ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
(US $=2)

সম্পাদকীয় যোগাযোগঃ
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৫, সিডিএ, সি/এ (তেতলা) মোমিন রোড,
চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৮৮৫৫

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট এর একটি প্রকাশনা

website : www.sufimaizbhandari. org
e-mail address :
alokdhara@sufimaizbhandari.org
sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ *সম্পাদকীয় :* মিরাজের দর্শন ও তাৎপর্যের অসীমতায় লুকায়িত মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনা ---------- ২
■ মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা
–বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর ---------- ৩
■ পূর্ব এশীয় সমুদ্র অঞ্চলের 'বদর পীর' হযরত সৈয়দ হুছন হামিদ (রঃ)
–মোঃ মাহবুব উল আলম ---------- ৫
■ জলোয়া-এ নুরে মোহাম্মদী বা তফ্‌হিরে ছুরা এনশেরাহ্
–হযরত মৌলানা শাহ্ সূফি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী ---- ৭
■ মি'রাজ শরীফ
– সাইয়েদ আবদুল হাই ---------- ১১
■ বিশ্ব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সূফিবাদী সমাধান
– এ. এন. এম. এ. মোমিন ---------- ১৩
■ নবীয়ে করিম (দঃ) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা
–মাওলানা গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান ---------- ১৬
■ হযরত আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তরিকতেরও ইমাম
– মাওলানা মুজিবুর রহমান নেজামী ---------- ১৯
■ বিস্ময়কর সূফি প্রতিভা মোল্লা আব্দুর রহমান যামী (রাহ্)
– অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ---------- ২১
■ আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়
–অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী ------ ২৩
■ মুসলিম নেতৃত্ব-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত
–মূলঃ টিমেথি জে. জ্ঞানতি, পি.এইচ.ডি.
–অনুবাদঃ মোঃ গোলাম রসুল ---------- ২৭
■ মাশুকের দিদার লাভের পথ
–আবু মোহাম্মদ জাফরুল হক ---------- ২৯
■ আত্মার স্বরূপ : ইসলামী চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের পুনরুজীবন
– মূল : এম. ফেতুল্লাহ গুলেন
– অনুবাদ : মুহাম্মদ ওহীদুল আলম---------- ৩১
■ সুফি দর্শন ও নৈতিকতা
–ড. জিনবোধি ভিক্ষু ---------- ৩৪
■ মহান সূফিসাধক হযরত মাওলানা শাহ্ সূফি বশক আলী শাহ্ মাইজভাণ্ডারী (রঃ)
– প্রফেসর শাহজাদা সৈয়দ সফিউল গনি চৌধুরী ---------- ৩৯
■ নবীদের ইতিহাস
– অনুবাদঃ মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ---------- ৪৪
■ সংগঠন সংবাদ ---------- ৪৫

সম্পাদকীয়...

মিরাজের দর্শন ও তাৎপর্যের অসীমতায় লুকায়িত মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনা

মিরাজ মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি মহিমান্বিত বিষয়। মিরাজ বলতে আভিধানিক অর্থে ঊর্ধ্বগমন বুঝালেও আধ্যাত্মিক অর্থে তা মহামিলনকে বোঝায়। নবুওতের একাদশ বর্ষে রজবের সাতাশ তারিখের শেষ রাতে মি'রাজের মত সর্বকালের সেরা ঘটনা ঘটেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, শেষ রাতকেই রকেট উৎক্ষেপনের উপযুক্ত সময় বলে আজকের বিজ্ঞানীরাও মনে করেন। মিরাজের মহাঘটনা যে মহানবীর (দঃ) জীবনে সবচেয়ে বিস্ময়কর ও আলোচিত ঘটনা হয়ে থাকবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কাবা শরীফের কাছেই নবী (দঃ) সেদিন শুয়েছিলেন। অনেকবার এলেও তৃতীয় বারের মত সেদিন গগনজোড়ারূপে বুরাকসহ এলেন ফেরেশতা সরদার হযরত জিবরাঈল (আঃ)। মহাভ্রমণের কিরূপ প্রস্তুতি নিতে হবে তা তিনি জানতেন। আমাদের রকেটের মত সে বুরাক কিন্তু প্রাণহীন নয়। যন্ত্র যেখানে অচল, প্রাণময় বুরাক সেখানে শুধু সচলই নয়-অকল্পনীয় গতিবেগসম্পন্ন ও সর্বপরিবেশ উপযোগী। চতুর্থবারের মত নবীজীর (দঃ) বক্ষ বিদারণ শেষে মুহূর্তে আল-আকসা মসজিদে পৌঁছান তাঁরা। মানব জ্ঞানের স্বল্পতার বিবেচনায় পবিত্র কুরআনে মহাভ্রমণের এ অংশটুকুই মাত্র বিবৃত হয়েছে।

বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বিশেষ বিখ্যাত নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করে একে একে আসমান পেরিয়ে সীমানা নির্ধারক কুল গাছ "ছিদরাতুল মুনতাহায়" উপনীত হলে জিবরাঈল (আঃ) জানালেন, এর উপরে যাবার অধিকার তাঁর নেই। 'হাওযে কাওছার', বেহেশ্‌ত ও দোযখ দেখবার পর আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হবার পালা এল। স্বচ্ছ সবুজ নূরের আসন 'রফরফে' চড়ে চললেন তিনি। সত্তর হাজার নূরের পর্দা পেরিয়ে পৌঁছলেন পবিত্র আরশে। দুনিয়ার সম্রাটেরা সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন করেন। স্বদেশের সব জায়গায় প্রভাব থাকে তাঁদের। বিশ্ব সম্রাটের আরশ কুর্সি তার চেয়ে ঢের বিশাল জিনিস।

যে নবী (দঃ) এর সৃষ্টি না হলে 'আরশ-কুরসী' কেন, সৃষ্টিরই সূচনা হতো না, তাঁর পদধূলিতে আরশ ধন্য হল। চলল বাক্য বিনিময়, যা নামাজের 'আত্তাহিয়্যাতুতে' আজো স্মরণ করা হয়। সবচেয়ে বিশিষ্ট নবীদের অন্যতম হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নূর দর্শনে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। কোন চর্মচক্ষুই তাঁকে দেখতে সক্ষম নয়। হযরত মুসা (আঃ) প্রত্যাশা করেও পারেন নি। মহানবী (দঃ) কিন্তু চাননি কিছুই; সেই মহান সত্তা তাঁকে ধনুকের দুটি জ্যা বা তার চেয়েও নিকটতর সান্নিধ্যে নিলেন। সালাত হচ্ছে মু'মিনদের মিরাজ, সেই সওগাত নিয়ে ফিরলেন তিনি। মুহূর্তকাল হলেও মিরাজে সাতাশ বছর কেটে যায় বিশ্ব নবীর (দঃ)। অন্তিমকালে হযরত জিব্রাইল (আঃ) জানিয়েছিলেন যে, তাঁর (নবীজীর) বয়স নব্বই বছর। প্রিয় হাবিবের সান্নিধ্যার্থে কাল প্রবাহকে আল্লাহ্‌ তখনকার জন্যে স্থগিত রেখেছিলেন।

মিরাজের মহা ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু মহানবী (দঃ) স্বয়ং। কল্পনাকেও ছাড়িয়ে সর্বকালের বিস্ময় রেখে গেছেন তিনি। পরীক্ষিত সাহাবারা সে ঘটনা সাথে সাথে বিশ্বাস করে যেমন নিজেদের বিশ্বাসের দৃঢ় প্রমাণ দিয়েছেন, তেমনি মিরাজ রজনীর প্রত্যুষে নবী মুখে তা শুনেও অনেকে তাদের বিশ্বাসের স্বচ্ছতার অভাব ও দূরদর্শিতার অভাবকেই স্পষ্ট করেছেন। তাদের উপহাসের জবাবে নবীকে (দঃ) পথের সব ঘটনার বিবরণ দিতে হয়েছে। এখন টেলিভিশনের যুগে বর্ণনার দরকার নেই যে, কিভাবে তিনি তাদের সামনে 'আল-আকসা' মসজিদের সব বিবরণ পেশ করেছিলেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে, সবই অলৌকিকভাবে ঘটেছিল। যান্ত্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিপদ যাঁরা জানেন তারা মিরাজের বৈজ্ঞানিক তথ্য লিখতে কম উৎসাহিত হয়েছেন। যে স্বপ্ন জগতের সাথে আমরা পরিচিত, তা আধ্যাত্মিক জগতের সূচনামাত্র। অতএব, যান্ত্রিক জগতের যেখানে শেষ, আধ্যাত্মিক জগতের সেখানে শুরু।

আজকের যুগে মিরাজ সহজ সত্য। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মিরাজতো অজানা অনেক ঘটনা আবিষ্কারে মানুষকে এগিয়ে দিয়েছে। এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান সর্বদাই ধর্মকে বুঝতে সাহায্য করেছে। আজকে মানুষ স্বীয় বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে মহাশূন্যে পাড়ি জমানো সম্ভব করেছে। মানুষ তার মহত্তম প্রচেষ্টা নিজের উন্নয়নে নিয়োগ করলে কতই উর্ধ্বেই না সে আসীন হতো! মহানবী (দঃ) মানুষের মান বাড়াতে এসেছিলেন; তাঁর প্রতিটা কাজ, জীবনের প্রতিটি অধ্যায় এত উত্তম এবং স্থায়ী যে, যারা তাঁর সমালোচনা করেছে, তারাও বিস্ময়ে তাঁকে উপলব্ধি করেছে। তাঁর মত বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছেই অবতীর্ণ হয়েছিল কুরআনের মত জ্ঞানালোক। ওহীলব্ধ জ্ঞানের প্রগাঢ়তায় 'নিরক্ষর' হয়েও জ্ঞানের রাজ্যে তিনি সবার শ্রেষ্ঠ। আজকে যদি কেউ মিরাজে সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে প্রশ্ন জাগে কিভাবে সে লব্ধ ওহীসমূহে বিশ্বাসী প্রমাণিত হতে পারে? অথচ এসব বিষয়ে বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলামের মূলভিত্তি। মানুষের এমনকি মানবিক চেতনার উৎকর্ষের জন্যও তা অপরিহার্যই বটে!

মানুষকে চারিত্রিক সোপানের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত করার উদ্দেশ্যে নবীজীর (দঃ) আবির্ভাব ঘটেছে। মিরাজের দর্শন ও তাৎপর্যের মধ্যে মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিহিত। মিরাজ মহাজগৎ ও এর স্রষ্টার সাথে মানুষের সংমিশ্রণের বিস্ময়কর রসায়ন। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের সকল ওলী-আল্লাহ্‌ এই জন্যই বুঝি সালাতের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে মিরাজের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করার তৌফিক দিন, আমীন।

মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

● বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর ●

মি'রাজ হল আল্লাহর কুদরত ও মহানবী (দ.)'র অন্যতম মু'জিযাহ। স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন 'সুবহানাল্লাযী আসরা বা পবিত্রতা ওই সত্তার, যিনি রাতের ক্ষুদ্র অংশে পরিভ্রমণ করান' বলে পরিভ্রমণের সম্বন্ধ নিজের সাথে করেন, তখন আল্লাহর কুদরতে বিশ্বাসী কেউ মি'রাজের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্নই তুলতে পারেনা। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে মানুষ যখন মঙ্গল গ্রহে বসবাসের চিন্তা করছে, তখন মহানবী (দ.)'র স্বশরীরে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দস হয়ে পর্যায়ক্রমে সপ্ত আসমান অতিক্রম করে সিদরাতুল মুনতাহা পিছনে ফেলে আর্শে আযীম তথা স্থান-কালের উর্ধ্বে গমনকে স্বাপ্নিক বলা ঘুমন্ত বিবেকেরই পরিচায়ক। আমরা জানি এবং মানি যে, মহানবী (দ.) ইন্দ্রিয় চোখেই আল্লাহর দর্শন লাভ করেন। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল-প্রমাণতো রয়েছেই, সে সাথে বিজ্ঞানসম্মত বিবেকগ্রাহ্য যুক্তিও ঢের আছে। ওই সব যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা না করে আলোচ্য নিবন্ধে আমরা মি'রাজ প্রাসঙ্গিক এমন এক বিষয়ের আলোচনায় মনোনিবেশ করবো, যা সচরাচর আলোচিত হয়না।

মি'রাজ সিঁড়িকে বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (দ.)'র জন্য এক নূরানী সিঁড়ি স্থাপন করা হয়, যাতে করে তাঁকে উর্ধ্বলোক পরিভ্রমণ করানো হয়; যার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ও তাঁর হাবীব (দ.) ই ভাল জানেন।

আমরা জানি যে, নামায মুসলমানদের জন্য মি'রাজ শরীফের তুহফা। অর্থাৎ মহানবী (দ.)'র মি'রাজ কালেই নামায ফরয হয়; এ নামাযের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়, যা মি'রাজের প্রতিচিত্র আত্তাহিয়্যাত-এ মি'রাজের আলোকরাজি ও জ্যোতির বিচ্ছুরণাদির উপলব্ধি অর্জিত হয়। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (দ.) নামাযকে মু'মিনদের মি'রাজ আখ্যায়িত করেছেন।

আর একটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে, রাসূলুল্লাহ (দ.)'র মি'রাজ ছিল যে, তিনি আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হন এবং কোন রূপ পর্দা ছাড়াই আল্লাহর সৌন্দর্য অবলোকন করেন। পরন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত এ দুনিয়ার পার্থিব জীবনে বাহ্যিক চোখে আল্লাহর দর্শন লাভ না কারো হয়েছে, না হবে। এ জন্যই আমাদের মি'রাজ হল হুযূর (দ.) পর্যন্ত পৌছা; এ রূপে যে, হুযূর (দ.)'র এতই নৈকট্য আমাদের অর্জিত হবে যে, আমরা এ দুনিয়ায় জাগ্রতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (দ.)'র পবিত্র সৌন্দর্য আপন চোখে দেখার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবো।

উক্ত দর্শনালোকেই তাশাহহুদে 'আস্সালামু আলায়কা আয়্যুহান্নবীয়্যু ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'র শব্দাবলী রাখা হয়েছে। নামাযে স্বেচ্ছায় আল্লাহ ভিন্ন কাউকে ডাকা নামায বাতিল হওয়াকে আবশ্যক করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (দ.) কে সম্বোধন সূচক শব্দে আহবানই ওয়াজিব বা আবশ্যক। জানা গেল যে, মু'মিন নামায অবস্থায় হুযূর (দ.)'র উপস্থিতি দ্বারা ধন্য হয়। অতএব সে যদি আপন আত্মার পবিত্রতা পরিশুদ্ধি, প্রেম-ভালবাসা ও আন্তরিকতা এত শক্তিশালী করে নেয় যে, 'আস্সালামু আলায়কা আয়্যুহান্নবীয়্যু' বলার সময় তার ধ্যান ও জ্ঞান নয়নে 'নূরে জমালে মুহাম্মদী' অবলোকন করে; তবে তা-ই তার মি'রাজ। কেননা হুযূর (দ.) পর্যন্ত পৌছা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা, তাঁকে দেখা আল্লাহকেই দেখা। হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে 'মন রায়ানী ফাক্বাদ রায়াল হক্ব' যে আমাকে দেখেছে, সে হক্ব বা অখন্ডিত সত্য তথা চিরন্তন সত্য আল্লাহকে দেখেছে। এ জন্যই হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গযযালী (রা.) ইহইয়াউল উলুম গ্রন্থে লিখেছেন, 'ওয়াহদির ফী ক্বলবিকা আন্নবীয়্যা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়া শখসা হুল করীম ওয়াক্বুল আস্সালামু আলায়কা আয়্যুহান্নবীয়্যু ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' অর্থাৎ নামাযাবস্থায় আপন অন্তরে রাসূলুল্লাহ (দ.) কে উপস্থিত কর এবং বল 'আস্সালামু আলায়কা আয়্যুহান্নবীয়্যু ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। (ইহইয়াউল উলূমিদ্দীন ১ম খণ্ড ১৭৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর সৌন্দর্য অবলোকনের দর্পণ হল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (দ.)। এ জন্যই সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আপন ধ্যান-জ্ঞানে সদা জগৎগুরু রহমতুল্লিল আলামীন (দ.)'র ধ্যান রাখতেন এবং রূহানী উৎফুল্লতা ও ফয়য-বরকত অর্জন করতেন। আমর বিন হরিস (রা.) বলেন, 'কা-আন্নী আনযুরু ইলা রাসূলিল্লাহি আলাল মিম্বরি' অর্থাৎ 'আমি যেন ধ্যান-নেত্রে রাসূলুল্লাহ (দ.) কে মিম্বরের ওপর দেখছি' (মুসলিম শরীফ ১ম খ- ৪৪০ পৃষ্ঠ)।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)'র এ রীতি নীতির আলোকে সূফীয়ায়ে ইজাম শায়খের ধ্যানকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌছার ভিত্তি সাব্যস্ত করেন। শাহ অলীয়ুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) আল্ কাওলুল জমীল গ্রন্থে লিখেছেন, 'আর্ রুক্নুল 'আযমু রবত্তুল ক্বলবি বিশ্শায়খি আলা ওয়াসফিল মুহব্বতি ওয়াত্তা'যীমি ওয়া মলাহিযাতু সূরাতিহী' অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্যে গমন পন্থায় প্রধান স্তম্ভ হল, অনুসৃত শায়খের সাথে অন্তরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সংযোগ এবং তাঁর (শায়খের) আকার-আকৃতি অবলোকন-নিরীক্ষণ-ধ্যান করা'। যা আরিফে কামিল বাহরুল উলুম আবুল বরাকাত সৈয়্যদ মুহাম্মদ আবদুল গনি কাঞ্চনপুরী (রা.)'র ভাষায় 'বসাইব হৃদাসনে, নিরীক্ষিব তাঁর পানে; অহরহ এ জীবনে আর কিছু হেরিব নারে' মর্মে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শায়খ হল জমালে মুস্তফায়ী দেখার আয়না। ইবনে হাব্বান কিতাবুদ্দু'ফা এ এবং দায়লামী মসনদুল ফিরদাউসে আবু রাফে এর সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আশ্শায়খ ফী কওমিহী কান্নবীয়্যি ফী উম্মতিহী' পীর আপন মুরীদদের মাঝে। নবী যেমন উম্মতগণের মধ্যে'। এ হাদীসটির ক্ষেত্রে জাল কিংবা পরিত্যক্ত মর্মে কেউ কেউ মন্তব্য করলেও জালালুদ্দীন সুয়ূতীর জামিউস সগীর গ্রন্থের বর্ণনা আলোকে প্রমাণিত হয় যে, এটি জাল কিংবা পরিত্যক্ত মোটেও নয়। অবশ্য সুয়ূতীর বর্ণনায় শব্দের কিঞ্চিৎ তারতম্য রয়েছে। তিনি লিখেছেন 'আশ্শায়খু ফী আহলিহী কান্নবীয়্যি ফী উম্মতিহী' অর্থাৎ শায়খ আপন আহল বা সম্প্রদায়ের তথা ভক্তকুলে ঠিক তেমনই যেমন নবী আপন উম্মতের মাঝে'।

অতএব প্রমাণিত হয় যে, শায়খকে দেখা নবীকে দেখা আর নবীর দর্শন স্বয়ং আল্লাহরই দীদার। আল্লামা জালালুদ্দীন রূমী (রা.) লিখেছেন,

চুঁ তু যাতে পীর রা করদি কবুল, হাম খোদা শামিল ব যাতাস্ত হাম রাসূল।

'যখন তুমি পীরের সত্তা গ্রহণ করেছ, খোদা ও রাসূল ওই সত্তায় শামিল রয়েছে'।

সুতরাং বলা যায় যে, তাসাওউরে শায়খ বা আপন পীর-মুর্শিদের ধ্যানের মাধ্যমে জমালে মুস্তফায়ী (দ.)'র দর্শন লাভ ঘটলেই নামায হবে 'আস্সালাতু মি'রাজুল মু'মেনীন' অন্যথায় 'ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন'।

আল্লাহ আমাদের সে রূপ নামায প্রতিষ্ঠার তৌফিক এনায়েত করুন।

সূফি উদ্ধৃতি

■ আউলিয়াদের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা কঠিন কোন কাজ নেই।

■ স্বাদে তৃপ্তি আর চেষ্টায় বিশ্বাস এ দু'টোকে ত্যাগ করতে পারলেই দাসত্বের হক আদায় হয়।

■ নিজেকে নিয়ামতের অনুপযুক্ত বলে ধারণা করাই শোকর বা কৃতজ্ঞতা।

■ যে স্থানে মিথ্যা না বললে রক্ষা পাওয়া মুশকিল সে স্থানেও মিথ্যা না বলা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা।

■ প্রকৃত ফকীরের লক্ষণ হল সে কারও কাছে কিছু চায় না, কারও সাথে ঝগড়া করে না, কেউ ঝগড়া করতে চাইলেও চুপ করে থাকে।

■ ধৈর্য্য মানুষকে বিনা প্রার্থনায় ও বিনা মিনতিতে আল্লাহর সাথে লিপ্ত রাখে।

■ রুজী-রোজগার উপার্জন না করার নামও তাওয়াক্কুল।

■ দোজাহানের কারও চেয়ে নিজেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মনে না করা, আর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও মুখাপেক্ষী না হওয়াই হল নম্রতা বা বিনয়।

—হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

পূর্ব এশীয় সমুদ্র অঞ্চলের 'বদর পীর' হযরত সৈয়দ হুছুল হামিদ (রঃ)

সম্পাদনা ও ভাষান্তরঃ

● মোঃ মাহবুব উল আলম ●

আমাদের বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে যেমন রয়েছে হযরত বদর শাহ (রঃ)-এর স্মৃতিধন্য বদরপাতি; তেমনি আরেক মহান ওলী আল্লাহর স্মরণেও শ্রীলংকা থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে রয়েছে হযরত সৈয়দ হুছুল হামিদ (রঃ)-এর স্মরণে 'মাজার গাহ'। সমুদ্রে অভিযাত্রীরা আমাদের দেশে যেমন বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার লাভের উদ্দেশ্যে 'বদর পীরের' স্মরণের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত কামনা করেন, তেমনি দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ সমুদ্র এলাকায় উচ্চারিত হয় হযরত সৈয়দ হুছুল হামিদের (রঃ) নাম।

উচ্চ মার্গের কারামত সম্পন্ন ওলী আল্লাহ্ হযরত হুছুল হামিদের (রঃ) পরিচিতি বিপদাপন্ন সমুদ্রগামী জাহাজের ত্রাতা হিসেবে। মশহুর আছে যে, তাঁর দোয়ার বরকতে বিপদাপন্ন সামুদ্রিক জাহাজ উদ্ধার ও সুরক্ষা লাভ করে। এ তথ্য প্রকাশ করেছেন আমেরিকার কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ প্রফেসর ডেনিস বি ম্যাক গিলভারী।

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের বিভিন্নস্থানে তাঁর নামে দরগাহ বিদ্যমান। তবে তাঁর প্রকৃত মাজার শরীফ রয়েছে মালয়েশিয়ার পেনাঙ্গে। পেনাঙ শহরের চুলিয়া (চুল্যা) সড়ক ও কিং সড়কের কোণায় এই মাজার শরীফের অবস্থান। এই মাজার শরীফ 'নাগোর মাজার' হিসেবে পরিচিত।

চুলিয়া বা চুল্যা শব্দটি ভারতের তালিম নাড়ু ও অন্ধ্র প্রদেশের পূর্ব উপকূলীয় কোরোমান্ডেল উপকূলের বাসিন্দা তামিল মুসলিম ব্যবসায়ীদের পরিচিতিসূচক শব্দ। এসব মুসলিম ব্যবসায়ীকে 'চুলিয়া' বা চুল্যা বলা হয়। চুলিয়া সড়কের উভয় পাশে সারিবদ্ধভাবে রয়েছে ভারতীয় মুসলিম ব্যবসায়ীদের রেস্তোরাঁ ও দোকান পাট।

॥ ২ ॥

নাগোর মাজারে রক্ষিত কাগজপত্র থেকে জানা যায়, হযরত সৈয়দ হুছুল হামিদের (রঃ) পূর্ণ নাম হল "হযরত সৈয়দ হুছুল হামেদী কাদির গুজ্জাসাভী আন্দাবার আওয়ারগাল"। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর কোন এক শুক্রবারে ভারতের অযোধ্যার নিকটে মনিকাপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি হযরত বড়পীর শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া ত্বরিকার অনুসারী ছিলেন। তাঁর পিতা হযরত সৈয়দ হাসান কুদ্দুস (রঃ) ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদের (দঃ) ২১তম অধঃস্তন পুরুষ। মায়ের নাম বিবি ফাতিমা, যিনি স্বপ্নযোগে এই ওলী-পুত্রের আবির্ভাব সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবগত হয়েছিলেন। তাঁকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর কোলে এমন এক সন্তান আসবেন, যিনি একাধারে দুর্গতদের ত্রাণকারী ও ইসলামের একজন মহান কাণ্ডারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন।

বাল্যকালেই সৈয়দ হুছুলের মাঝে সবিশেষ প্রজ্ঞা, মমত্ববোধ ও রূহানী অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি আরবী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি এক দরবেশের সাহচর্যে অবস্থান করেন এবং কামালিয়াত অর্জনান্তে ৪০৪ জন শিষ্যসমেত আবার মনিকাপুরে গমণ করেন। এখান থেকে তিনি আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও অন্যান্য স্থানে সফর করেন। প্রকাশ আছে যে, এসব সফরকালে তাঁর অসংখ্য কারামত প্রকাশ পায়। এসব কারামতের মধ্যে রয়েছে মৃতের উত্থান, বোবার মুখে কথা ফোটানো, খঞ্জকে সুস্থতা প্রদান এবং বিভিন্ন রোগ থেকে অনেকের মুক্তিলাভ।

॥ ৩ ॥

কয়েকটি কারামত ঃ

হযরত সৈয়দ হুছুল (রঃ) লাহোরে একটা মসজিদে অবস্থানকালে কাজী নুরুদ্দিন নামে এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। কাজী নুরুদ্দিন অত্যন্ত ধনাঢ্য ও ধার্মিক লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তিনি একজন সন্তান প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দোয়া কামনা করেন। হযরত হুছুল (রঃ) কয়েকটা সুপারী কাজী নুরুদ্দিনের হাতে দিয়ে সেগুলো তাঁর পত্নী জোহরা বিবিকে খেতে দিতে বললেন।

এদিকে কাজী নুরুদ্দিনকে একটানা ৪০ দিন তাঁর সাথে

থেকে যাবার নির্দেশ দিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি পত্নীর সাথে দেখা করতে পারবেন না। ৯৫৯ হিজরী সনে বিবি জোহরা একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। এ সন্তানের নাম রাখা হয় হযরত ছহুলের (রঃ) ভাই সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফের নামানুসারে।

হযরত ছহুলের (রঃ) সর্বশেষ কারামতের অন্যতম হলো গুরুতর রোগ থেকে তাঞ্জোরের রাজাকে সুস্থ করে তোলা। তাঞ্জোরের রানীর সন্তান প্রাপ্তির জন্যও তিনি দোয়া করেন। কৃতজ্ঞ রাজা তাঁকে বহু ধন-সম্পদ উপঢৌকন দিতে চান। কিন্তু তিনি সেসব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর কবরের জন্য একখণ্ড জমিমাত্র চান। এই জমিতে তাঁকে দাফন করা হয় এবং এখানে নির্মিত হয় তাঁর মাজার শরীফ। হযরত ছহুল (রঃ) ৬৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর সমাধিস্থল 'নাগোর মাজার' এখন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের তীর্থস্থান। প্রতি বছর জমাদিউল আখের মাসের প্রথম তারিখ থেকে ১৪ দিন ধরে তাঁর ওরশ শরীফ উদ্‌যাপিত হয়। এই ওরশ শরীফ 'কান্দুরী ওরশ' হিসেবে পরিচিত।

নাগোর মাজার শরীফের স্থাপত্য শৈলীর সাথে মোগল স্থাপত্যের সাদৃশ্য বিদ্যমান। ১৮০০ শতক থেকে বর্তমান মাজার শরীফ অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। মাজার শরীফ সৌধের পার্শ্ব দেয়ালে নির্মিত কুঠরীগুলোতে এখনো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দোকান-পাতি রয়েছে।

এসব ক্ষুদ্র দোকানকে 'বুটিকা' বা 'বুটেকা' বলা হয়। 'বুটিক' শব্দটা এসেছে এই শব্দ থেকে। 'বুটিকা' শব্দটি সিনহলা ভাষার শব্দ, এর অর্থ দেশী ক্ষুদ্র দোকান ঘর। এই বুটিকা শব্দটি মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে। জামা-কাপড়ের শৈলী বৃদ্ধির কর্মকে এই অঞ্চলে বুটিক বলা হয়।

[সূত্র : ইন্টারনেট]

সূফি উদ্ধৃতি

■ চোখের পর্দাই হল সর্বাপেক্ষা বড় পর্দা, যার দ্বারা লোক শরীয়ত বিরোধী কাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

■ খাদ্য ভর্তি উদরে কখনও জ্ঞান ও বুদ্ধির স্থান হয় না।

■ পরহেজগারীর ধনে যার অন্তর পূর্ণ, সেই বড় ধনবান।

–হযরত যুননুন মিসরী (রহঃ)

■ খাঁটি আরিফ ঐ ব্যক্তি যিনি ইবাদত ও রিয়াজতের তরবারি দ্বারা সব কামনা বাসনাকে কেটে ফেলে দিয়েছে। আত্মার আকাঙ্ক্ষাগুলোকে যবেহ করে দিয়েছে।

■ আরিফ নীরব থাকলে তার ইচ্ছা জাগে মাবুদের সাথে বাক্যালাপের, যখন সে চক্ষু বুজে তখন তার বাসনা জাগে মাবুদের সাক্ষাতকারের, যখন সে দু'হাটুর মাঝে মস্তক রেখে চোখ বুজে থাকে তখন সে ভাবতে থাকে এখন ইস্রাফীল সিঙ্গায় ফুঁক দিলে মস্তকত্তোলন করে মাবুদের সাথে সাক্ষাত হয়ে যেত।

■ আরিফের জন্য যা অবশ্য পালনীয়, তা হল মাল-দৌলতের প্রতি নিস্পৃহ থাকা, বেহেশতের ভরসা না রাখা ও দোযখের পরোয়া না করা।

–হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)

জলোয়া-এ নুরে মোহাম্মদী বা তফছিরে ছুরা এনশেরাহ্

● হযরত মৌলানা শাহ্ সূফি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী ●

জলোয়া-এ নুরে মোহাম্মদী বা তফছিরে ছুরা এনশেরাহ্ হযরত মৌলানা শাহ্ সূফি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী (রহঃ) (১৮৮০-১৯৮৫ইং) রচিত একটি সুলিখিত গ্রন্থ। লেখক একজন উঁচু ধরণের আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। মুসলমান তথা সমগ্র মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন ওয়াজ ও লেখনির মাধ্যমে তাঁর পবিত্র হায়াতে জিন্দেগীতে আল্লাহর দিকে অবিরত দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। উল্লেখিত গ্রন্থে তিনি পবিত্র কালামের ৯৪ তম সূরা আলাম নাশরাহ্ এর সূফিয়ানা তফসির পেশ করেছেন। সম্মানিত গ্রন্থকারের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর অনুসৃত বানান ও বাক্যগঠন পদ্ধতি হুবহু বজায় রেখে আমরা তা এখানে প্রকাশ করছি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"আখিয়ার" ও "আবরার" এই দুই শ্রেণীর আউলিয়ার পরিচয় নিম্নলিখিত মশহুর হাদীছে পাওয়া যায়। হজরত জিব্রায়ীল (আঃ) হজরত রছুলুল্লাহ্ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, এহ্ছান কাহাকে বলে? তদুত্তরে রছুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছিলেন–

ان تعبدالله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك (مشكوة)

অনুবাদঃ এহ্ছান এই যে, তুমি যেন আল্লাহকে দেখিতেছ, এইভাবে আল্লাহর এবাদৎ কর। [এইরূপে মোরাকেবা করিয়া এবাদৎ করা বেলায়েত-এ এহ্ছান এবং এবাদৎকারী বেলায়েতে কোবরা এর মোকামের আবরার শ্রেণীর আউলিয়া] আর যদি তুমি (এবাদৎ করার সময়) আল্লাহকে দেখিতেছ, এইভাবে মোরাকেবা করিয়া এবাদৎ করিতে না পার, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে দেখিতেছেন এইভাবে মোরাকেবা করিয়া এ'বাদত কর। (এইরূপ মোরাকেবা করিয়া এ'বাদত করাও বেলায়েতে এহ্ছান এবং এবাদতকারী "বেলায়েতে ওয়াস্তার" মোকামের আখিয়ার শ্রেণীর আউলিয়া)। পরন্তু "আল্লাহ্" জিকর মুখে করিলে, কানে শুনিলে ক্বলবের লতিফা সমূহে অনুভব করিলে এবং নিঃশ্বাস ভিতরে টানিতে "আল্লাহ্" এবং নিঃশ্বাস ফেলিতে "হু" জিকর ক্বলবে জারী হইলে আল্লাহ তাআলার কোরবৎ ও মায়ীয়াৎ অর্থাৎ আল্লাহ নৈকট্য ও আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন, এই অনুভূতি জন্মাইয়া এশক-এ-হাকিকীতে যাহাদের শরীর ও মন শিহরিয়া উঠে, ক্বলব নাচিয়া উঠে, ভাবের আতিশয্যে নৃত্য ও কম্পন সর্ব শরীরে ব্যক্ত হয় এবং মুখ দিয়া হা, হু, হ'হ্, আঃ, উঃ হায় ইত্যাদি আওয়াজ ও জিকর বাহির হয়, ওয়াজ্দ হাল জাহির হয়, তাঁহারা সর্বোচ্চ শ্রেণীর এ'বাদতকারী, শাহাদৎ প্রার্থী, শহীদ হওয়ার আকাঙ্খী, শোহাদা-এ-আশেকীন আল্লাহ ভিন্ন অপর সব কিছু হইতে মৃত, "ফানা ফিল্লাহ", বেলায়েতে ওজমা "কোরবে নওয়াফেলের" মোকামের আউলিয়া। যথাঃ রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– "আমার বান্দাহ "নফল" এ'বাদত সমূহ সর্বদা করিতে থাকিলে আমি তাঁহাকে মহব্বত করি। যখন আমি তাঁহাকে মহব্বত করি, তখন আমি তাঁহার কান হই, যে কানে তিনি শোনেন, তাঁহার চক্ষু হই, যেই চক্ষে তিনি দেখেন, তাঁহার জিহ্বা বা ভাষা হই, সেই জিহ্বা ও ভাষার দ্বারা তিনি কথা বলেন, তাঁহার হাত হই, যেই হাতে তিনি কাজ করেন, তাঁহার পায়ের দ্বারা আমি তাঁহাকে হাঁটাই। (বোখারী শরীফ, হাদিছ এ কুদছি)"। অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগকে শুনান দেখান, কথা বলান, চালান ও তাঁহাদের হাত দ্বারা কাজ করান। এই মোকামে থাকাকালীন তাঁহাদের উপর আল্লাহ তাআলার ছিফত সমূহের তজল্লী হয়। তদবস্থায় জাহেরীতে তাঁহাদের মধ্য দিয়া আল্লাহ তাআলার ছিফৎ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যাহা কারামৎ, কশ্‌ফ, এলহাম ও এলকা নামে অভিহিত হয়। (এইরূপ হালে নবীগণ হইতে যাহা জাহের হইয়াছে, উহাকে মো'জেজা বলে)। এই "হাল" কায়েম থাকাবস্থায় সাংসারিক জ্ঞান লুপ্ত থাকে। অতঃপর উরুজ হইলে "বকা বিল্লাহ" হইয়া "কোর্বে ফরায়েজের" মোকামে স্থায়ী হন। ইহা আ'ম্বিয়তের মোকাম। এই মোকাম হইতে ظهور من الله (জহুর মিনাল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে 'হাদি' রূপে "খলিফায়ে রছুলুল্লাহ" বা "নায়েব-এ-রছুল" হইয়া মানব সমাজে জাহের হন। এই কোর্বে ফরায়েজ ও আ'ম্বিয়তের মোকামের ওলি, প্রতি শতাব্দীতে আমিরুল মো'মেনীন, ইমামুল আউলিয়া, সুলতানুল আউলিয়া, কুতুবুল আকতাব মোজাদ্দেদ ও গাউছুল আজম ইত্যাদি হইতে স্থান, কাল, পাত্র বা যুগোপযোগী কোন এক খেতাব প্রাপ্ত হইয়া দুনিয়াতে শরিয়ত, ত্বরিকত, হাকিকত ও মারফত ইত্যাদি প্রচার করেন। যথাঃ তহাওফ গ্রন্থ সমূহের ঐক্যমতে হজরত মাওলানা শাহ্ ছুফী এমদাদুল্লাহ (রাঃ) লিখিয়াছেন।

الولاية هو الفناء في الله والبقاء بالله والظهور من الله

অর্থাৎঃ ফানাফিল্লাহ ও বকাবিল্লাহ হইয়া আল্লাহ

তাআলার পক্ষ হইতে "হাদি" রূপে জাহের হওয়াই বেলায়েতে ওজমা। (জেয়াউল কুলুব)

এই মোকামের আউলিয়াগণ হইতে কেহ কেহ عهده مشيخت মশিখতের মনছব্ প্রাপ্ত হন।

হজরত মৌলানা শাহ ছুফী এমদাদুল্লাহ (রাঃ) অন্যত্র লিখিয়াছেন– المشيخت هو التصرف في الملك والملكوت باذن الله

অর্থাৎ– আল্লাহ তাআলার আদেশে বিশ্ব সাম্রাজ্যে ও স্বর্গলোকে তছররোফ করার ক্ষমতা পাওয়াই "মশিখত"। (জেয়াউল কুলুব) আউলিয়াগণের উপর ইমামতি করায় বেলায়েত এবং আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জগতে তছররোফ করার "মশিখত্" উভয় পদ কোন কোন জমানার একজন ওলি পাইয়া থাকেন। যথাঃ গাউছুল আজম শায়খ ছৈয়দ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জীলানী (রাঃ) এই মনছব পাইয়া ছিলেন বলিয়া তিনি নিজ ক্বছিদায় উল্লেখ করিয়াছেন। যথাঃ

তিনি আরও বলিয়াছেন– بلاد الله ملكي تحت حكمي

لكل ولي له قدم وانى - على قدم النبي بدرالكمال অর্থাৎ– "আল্লাহ তাআলার সাম্রাজ্যসমূহ আমারই সাম্রাজ্য, যাহা আমার হুকুমের নীচে অবস্থিত। আল্লাহ তাআলার মর্জিমত উহাতে আমি হুকুম জারী করি। প্রত্যেক ওলি এক এক নবীর কদমের নীচে থাকিয়া বা নিজ নিজ আদর্শ নবীর বিশেষত্ব লইয়া স্বরিকত জাহের করেন। আর আমি, (আবদুল কাদের) মোহাম্মদ (দঃ) এর কদমের নীচে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহারই আদর্শে ইছলামী নীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ নীতি ইত্যাদি মানব জাতির সমুদয় মঙ্গলময় নীতি প্রচার করি।"

আর কোন কোন জমানায় বেলায়েতের ইমাম একজন এবং মশিখতের ওলী আর একজন হইয়া থাকেন। যথাঃ- হজরত মুছা (আঃ) নবীয়ে মোরছল ছিলেন কিন্তু তিনি মশিখত এর পরিচালক ছিলেন না। হজরত খিজির (আঃ) সেই জমানার মশিখতের পরিচালক ছিলেন। এই মছআলা আমি ছুরা এ কাহাফের তফছিরে মুছা (আঃ) ও খিজির (আঃ) এর কিচ্ছা বর্ণনায় বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি; তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক মহোদয়গণ তাহা পাঠ করিয়া দেখুন।

এইরূপ সর্বশেষ জমানায় হজরত ইমাম মাহদি (আঃ) ও হজরত ইছা (আঃ) উভয়ে বেলায়েত ও মশিখত আল্লাহ ও রছুল (দঃ) এর মর্জিমত সম্পূর্ণরূপে পরিচালনা করতঃ বেলায়েতের পূর্ণতা সাধন ও সারা দুনিয়ায় ইছলাম প্রচার করিবেন এবং দাজ্জালকে নিহত করিয়া কুফরী, শয়তানী, শিরক ও গুনাহর কার্য্যসমূহ দুনিয়া হইতে বিদুরিত করিবেন। তখন দুনিয়াতে পুণ্যবান লোক ছাড়া পাপী থাকিবে না। দুনিয়া স্বর্গতুল্য সুখশান্তিময় হইবে। আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সফল হইবে। যথাঃ আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলিয়াছেন–

سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق - الاية

অনুবাদঃ শীঘ্রই আমি (আল্লাহ) আমার নিদর্শন সমূহ মনবগণকে সৃষ্ট জগতের সর্বত্র এবং তাহাদের নফছ সমূহের মধ্যে (অর্থাৎ মানুষের সাংসারিক জ্ঞান, পারলৌকিক জ্ঞান ও আকলে কুদছি দ্বারা আর "এ'লমে নবুয়ত" ও "এ'লমে বেলায়েত" এর পূর্ণতার দ্বারা অধিকন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চরম উন্নতির দ্বারা) দেখাইব যেন তাহাদের জন্য স্পষ্টরূপে আল্লাহ ই হক্ব-সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (কোরআন)।

এই আএতের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতের নিদর্শনসমূহ মানবগণকে আদম (আঃ) এর জমানা হইতে দেখাইয়া আসিতেছেন এবং সর্বশেষ যমানা পর্য্যন্ত দেখাইবেন। তখন সমস্ত মানব আল্লাহকে হক্ব-সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে। আল্লাহর এই সুসংবাদ সত্য হইবে বলিয়া ঈমান রাখিতে হইবে। একদিন সকলেই আল্লাহ ও দীন-এ- ইছলামের উপর ঈমান আনিবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে। নতুবা আল্লাহর কালাম কোরআন এ মজিদের এই আএতকে অবিশ্বাস করার দরুণ ঈমান হইতে খারিজ হইবে। অথচ এ যাবৎ দুনিয়ার সব লোক আল্লাহ ও দীন-এ-ইছলামের উপর ঈমান আনে নাই। সুতরাং ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসিবে, ও মশহুর হাদীছে উক্ত হইয়াছে যে, সর্বশেষ জমানায় ইমাম মাহদী (আঃ) আসিবেন এবং দুনিয়ার সব লোক ইছলাম গ্রহণ করিবেন। ইমাম মাহদী (আঃ) এর দ্বারা বেলায়েত পূর্ণতা প্রাপ্ত ইহবে। অতএব তিনিই খাতেমুল ওলি। অতঃপর দজ্জাল শয়তানের পূর্ণ শক্তি লইয়া ইমাম মাহদী (আঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। সেই সময় আল্লাহ তাআলার কুদরতে হজরত ইছা (আঃ) অবতরণ করিয়া ইমাম মাহদী (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। উভয়ে এক জমা'আতে নমাজ সমাপন করার সময় ইমাম মাহদী (আঃ) "হজরত ইছা (আঃ) কে সসম্মানে বলিবেন, "আপনি আল্লাহর নবী। সুতরাং নমাজের জমাআ'তে ইমামতি করুন।" হজরত ইছা (আঃ) উত্তর দিবেন, "আমার নবুয়তের যুগ বহু পূর্বেই গত হইয়া গিয়াছে, এখন আমি নবীরূপে দুনিয়াতে আসি নাই বরং উম্মতে মোহাম্মদীর আনছার বা সাহায্যকারী রূপে আল্লাহ তাআলা আমাকে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। আপনি (ইমাম মাহদী) উম্মতে মোহাম্মদীর সর্বশেষ ইমামুল আউলিয়া ও খলিফা। সুতরাং আপনাকেই নমাজের জমাআ'তে ইমামতি করিতে

হইবে। আমি মোক্তাদী হইয়া নমাজ সমাপন করিব।" তারপর দাজ্জালকে কতল করার জন্য হজরত ইছা (আঃ) জেহাদে অগ্রসর হইবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করিবেন। তখন দুনিয়া হইতে দাজ্জালী ধুকা, প্রতারণা, মিথ্যা, শয়তানী ও দুঃখ-কষ্ট দুরীভূত হইবে। ইমাম মাহদী (আঃ) এর এন্তেকালের পর হজরত ইছা (আঃ) খলিফা হইয়া সেই শান্তি-রাজ্য ৪০ বৎসর পর্যন্ত পরিচালনা করিয়া ওফাৎ প্রাপ্ত হইবেন। আল্লাহ তাআলা যেই উদ্দেশ্যে দুনিয়ার মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় আর এই পরীক্ষার স্থান, দুঃখকষ্টের জায়গা, পরকালের কর্মক্ষেত্র ও জেলখানা দুনিয়ার আবশ্যকতা না থাকা হেতু আল্লাহ তাআলা ক্রমশঃ কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের দ্বারা পৃথিবীকে ও সমস্ত জগতকে ধ্বংশ করিয়া দিবেন। আখেরী জমানার নবী রছুলুল্লাহ (দঃ) এর উম্মতের খাতেমুল ওলি বা সর্বশেষ ইমামুল আউলিয়া ও খলিফার আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে হজরত ইছা (আঃ) এর পুনরাগমন ও দজ্জালকে ক্বতল করার ভবিষ্যদ্বাণী, ইছলাম জগতের যাবতীয় সুন্নী মুসলমানগণ হক্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। যাহারা ইহাকে হক্ব বলিয়া বিশ্বাস করে না, তাহারা আহলে সুন্নত ও জমাআ'ত হইতে খরিজ বলিয়া সুন্নী আলেমগণের অভিমত। আর হজরত ইছা (আঃ) যে এখনও ওফাত প্রাপ্ত হন নাই, আল্লাহ তাআলার কুদরুতে তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন, তাহা কোরআন, হাদীছ, এজমা ও কেয়াসের অকাট্য দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত ও ইছলাম জগতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। যাহারা ইহার বিরুদ্ধে মত পোষণ করে, তাহারা সুন্নী মুসলমান নহে বলিয়া ফতওয়া হইয়াছে। (আক্বায়েদের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য)।

হজরত ইছা (আঃ) যে এখনও জীবিত আছেন, তাহা নিম্নলিখিত কোরআনের আএত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যথা: আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته-الاية অনুবাদ: হজরত ইছা (আঃ) এর মৃত্যুর পূর্বে সমুদয় ইহুদি প্রভৃতি "আহলে কেতাব" হজরত ইছা (আঃ) সত্য নবী বলিয়া তাঁহার উপর নিশ্চয় নিশ্চয় ঈমান আনিবে। (কোরআন) ইহা অতি সত্য কথা যে, এ যাবৎ দুনিয়ার সমস্ত "আহলে কেতাব" হজরত ইছা (আঃ) কে নবী বলিয়া ঈমান আনে নাই। সুতরাং আল্লাহর কালাম-এ-পাক, কোরআনের মতে তিনি এখনো মরেন নাই, বরং জীবিত আছেন।

আমি ইতিপূর্বে হাদিছের ব্যাখ্যায় রছুলুল্লাহ (দঃ) এর এবাদতের বর্ণনায় দেখাইয়াছি যে, তাঁহার উম্মতের এবাদতকারী আউলিয়া তাঁহার এবাদতের অনুকরণে জিকর, মোরাকেবা, মোশাহেদা ইত্যাদি "আশগাল" ত্বরিকতের ইমাম মোর্শেদগণের শিক্ষানুযায়ী আমল করিয়া তাঁহারা পূর্বে বর্ণিত চারি শ্রেণীর বেলায়েত লাভ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে আখিয়ার,আবরার ও সত্ত্বার আউলিয়াগণ ত্বরিকতের ইমাম মোর্শেদ। এই আখিয়ার আবরার ও সত্ত্বার আউলিয়াগণের পরিচয় কোরআনে মজিদের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে পাওয়া যায়। যথা:– আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–انما المؤمنون الذين اذا ذكرالله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وّعلى ربهم يتوكّلون-الذين يقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون-اولائك هم المؤمنون حقاً-لهم درجت عندربهم ومغفرة ورزق كريم- অনুবাদ: নিশ্চয়ই সেই সব লোকই ঈমানদার, যখন 'আল্লাহ' জিকর করা যায় (অর্থাৎ নিজ মুখে ও অন্তঃস্থ লতিফায় 'আল্লাহ' জিকর হয় অথবা অপরের মুখে 'আল্লাহ' জিকর শুনেন কিংবা নিজ মনে আল্লাহর ভাব জাগে তখন ভয়ে বা আশায় অথবা মহব্বতে কিংবা এশক-এ-হাকিকি দ্বারা তাঁহাদের ক্বলব স্পন্দিত বা কম্পিত হয় ওয়াজদ হাল আসে। আর যখন আল্লাহর আয়াত (এ-কোরআন ও কুদরুতের নিদর্শনসমূহ) তাঁহাদের নিকট তেলাওয়াত করা যায় (অথবা আকলে মাআশ আকলে মাআদ ও আকলে কুদছির নুরে আয়াত প্রতিভাত হয়) তখন তাঁহাদের ঈমানের কামালিয়ত ও মজবুতি বাড়িয়া যায় এবং তাঁহারা তাঁহাদের পালনকর্ত্তা আল্লাহর উপর ভরসা করেন। সেই সকল লোক যাহারা "ছালাত-এ-খামছা" বা পঞ্চ নমাজ কায়েম রাখেন এবং তাঁহাদিগকে যেই সব নে'মত, রহমত, ফজল করম ও পবিত্র রিজিকসমূহ দান করিয়াছি তাহা হইতে (আল্লাহ তাআলার মহব্বতে) নিয়মিত খরচ করেন। (অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তি এ'লম ও দৌলত প্রভৃতি আল্লাহ তাআলার মর্জিমত খরচ করেন ও এই সবের যথাযথ সদ্ব্যবহার করেন); (৮) তাঁহারাই বাস্তবিক এলমুল ইয়াকীন, আয়নুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন (৯) দ্বারা হাকিকী ঈমান ওয়ালা। তাঁহাদের জন্য তাঁহাদের পালনকর্ত্তা আল্লাহ তাআলার নিকট (ঈমানের ও বেলায়েতের) দরজা ও মরতবাসমূহ রহিয়াছে। তাঁহাদের দোষত্রুটি, ভুল ও গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করেন এবং তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত রিজিক দান করেন। (কোরআন)।

আল্লাহ তাআলা অন্য আএতে বলিয়াছেন–
واذا سمعوا ماانزل الى الرّسول ترى اعينهم تفيض من الدمع ممّا عرفوا من الحق-الاية অনুবাদঃ এবং যখন তাঁহারা (অর্থাৎ হাকিকী ঈমান ওয়ালাগণ) উহা শুনেন, যাহা রছুল (দঃ) এর

উপর নাজেল করা হইয়াছে, (অর্থাৎ কোরআন ও ব্যাখ্যামূলক হাদিছ শুনেন)

তুমি দেখিবে যে, তাঁহাদের চক্ষুসমূহ হইতে অশ্রু বর্ষিত হয়। যেহেতু তাঁহারা চিনিয়াছেন যে, [রছুলুল্লাহ (দঃ) এর মুখ নিঃসৃত বাণী] কোরআন হক্ব- সত্য। (কোরআন)। এই আয়েত শরীফের দ্বারা বুঝা যায় যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এর উপর অবতীর্ণ বাণী শুনিয়া যাঁহাদের কান্না আসে, তাঁহারা মধ্যম স্তরের আউলিয়া।

আর এক আএতে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

والذين امنوا اشد حبا لله - الاية অনুবাদঃ যাঁহারা আল্লাহ তাআলা উপর হাকিকী ঈমান আনিয়াছেন, তাঁহারা আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর পথে, আল্লাহকে অতিরিক্ত মহব্বত করেন কঠোরতম আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলার প্রতি মহব্বত ব্যক্ত করেন। প্রাণান্ত মহব্বত করেন। (যাহাকে এশক বলা হয়।) [কোরআন]।

উপরে রছুলুল্লাহ (দঃ) এর উম্মতের এবাদতের যেই চারি শ্রেণী দেখানো হইয়াছে এবং তাঁহার উম্মতের আউলিয়াগণের চারি স্তর বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তদুর্দ্ধ উম্মত ছাহেবে মশিখত আউলিয়ার তারিফ করা হইয়াছে, তৎসমুদয় রছুলুল্লাহ (দঃ) এর 'এনশেরাহে ছদরের' ফয়েজ সম্ভূত বেলায়েতের বর্ণনা।

এতদ্বারা রছুল-এ-করিম (দঃ) এর শান জাহের ও জিকর উচ্চভাবে ঘোষিত হইয়াছে। তাঁহার উম্মতের আউলিয়াগণ বনি ইছরাইলের নবীগণের মত বলিয়া হাদিছ শরীফে উক্ত হইয়াছে। যথা: রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন–

علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل - جامع الصغير অর্থাৎ আমার উম্মতের হক্কানী আলেম-আউলিয়াগণ বনি ইছরাইলের নবীগণের মত। (হাদীছ)।

এতদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বনি ইছরাইলের নবীগণের প্রত্যেকের খছুছিয়ৎ বা বিশেষত্ব লইয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) এর উম্মতের এক একজন ওলী জাহের হইয়া নিজ আদর্শ নবীর বেলায়েতের মছআলা সমূহ প্রচার করিয়া আসিতেছেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে "বনি ইছরাইলের নবীগণের মত" বলিয়া হাদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ওলিগণ নবীগণের সম মর্যাদা সম্পন্ন নহেন। জানা আবশ্যক যে, এ'লমেদ্বীন দুই প্রকার। যথা: এ'লমে বেলায়েত ও এ'লমে নবুয়ত। রুহুল কুদছ বা জিব্রায়ীল ফেরেস্তার ওয়াস্তায় বা মাধ্যমে ওয়াহির দ্বারা ভাল মন্দ চিনিয়া লইয়া মানুষকে তাহা জ্ঞাত করার কাজে নিযুক্ত হওয়াই "নবুয়ত" আর বিনা মধ্যস্থতায় এলকা, এলহাম ও কশফের দ্বারা আল্লাহ তাআলা সৃষ্ট জগতের রহস্য অবগত হইয়া, পৃথিবীর শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজে নিযুক্ত হওয়াই 'বেলায়েৎ'। এই উভয় প্রকারের এলম যাঁহারা হাছেল করেন, তাঁহাদিগকে নবী বা রছুল বলা হয়, আর যাঁহারা কেবল এলমে বেলায়েত হাছেল করেন, তাঁহাদিগকে ওলি বলা হয়। কিন্তু এলমে নবুয়ত অপেক্ষা এলমে বেলায়েত শ্রেষ্ঠ। কারণ এলমে মা'মেলাতকে এলমে নবুয়ত আর এলমে আছরারকে এলমে বেলায়েত বলা হয়। (১০)

অতএব জানা গেল যে, এলমে বেলায়েত, এলমে নবুয়ত অপেক্ষা আফজল। কিন্তু নবী ওলিগণ অপেক্ষা আফজল। কারণ নবী এলমে বেলায়েত ও এলমে নবুয়ত উভয়টা কেবল আল্লাহ তাআলা হইতে প্রাপ্ত হন। আর ওলি নিজ নবী হইতে এলমে বেলায়েত পাইয়া থাকেন।

উপরে যে রেওয়ায়েত লিখিত হইয়াছে তাহাতে পাঠক মহোদয়গণ দেখিয়াছেন যে, আল্লাহ তাআলা রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আদম (আঃ) ও দাউদ (আঃ) এবং ছোলায়মান (আঃ) এর মত খেলাফৎ ও বাদশাহী দান করিয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে পরিশিষ্টে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইবে।

উক্ত রেওয়ায়েতে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আল্লাহ তাআলা ইউছুফ (আঃ) এর মত সৌন্দর্য্য দান করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য সর্বসাধারণের চক্ষে ইউছুফ (আঃ) এর মত পরিদৃষ্ট না হইলেও, তাঁহার বাতেনী সৌন্দর্য্য যে ইউছুফ (আঃ) এর সৌন্দর্য্যের চেয়ে অধিক ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যথা: জনৈক আশেকে রছুল বলিয়াছেন, محمد مصطفیٰ اور حضرت یوسف سے کیا نسبت

وہ مطلوب زلیخا تھے یہ محبوب خدا ٹھہرے

অনুবাদ: "মোহাম্মদ (দঃ) এর সৌন্দর্য্যের সহিত হজরত ইউছুফ (আঃ) এর সৌন্দর্য্যের তুলনা হইতে পারে কি?" ইউছুফ (আঃ) জোলায়খার মাশুক ছিলেন, আর মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ তাআলার মাহবুব হইয়াছেন।

নোটঃ (৮) পঞ্চ নমাজ ও আল্লাহ প্রদত্ত রিজকের সদ্ব্যবহার কিরূপে, কিভাবে করিতে হয় তাহা পরিশিষ্টে বিশদভাবে লিখিত হইবে।

(৯) এই ত্রিবিধ ইয়াকীন সম্বন্ধে পরিশিষ্টে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইবে।

(১০) কোরআন শরীফ হজরত মুছা (আঃ) ও হজরত খিজির (আঃ) এর কিচ্ছা দ্রষ্টব্য।

মি'রাজ শরীফ

● সাইয়েদ আবদুল হাই ●

মি'রাজ রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মদ মুস্তফা আহমাদ মুজতবা (দঃ)-এর জীবনে তো বটে বরং মানবেতিহাসেও এক অভূতপূর্ব ঘটনা। দুনিয়ার ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সশরীরে সাত আসমান পার হয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে মুলাকাত করেন। এই হল মি'রাজ। রাসূলুল্লাহ্ নবুওয়াতে যারা অবিশ্বাস করত, তারা এই ঘটনা শুনে রাসূলকে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করতে লাগল। তাঁকে অপ্রস্তুত করার জন্য তারা নানা রকমের প্রশ্ন করে। কিন্তু হযরত নবী-ই-করীম (দঃ)-এর কাছ থেকে তার উত্তর পেয়ে তারা নিজেরাই হয়ে গেল অপ্রস্তুত। হযরত আবু বকর (রাঃ) মি'রাজের ঘটনা শুনে সাথে সাথে বিশ্বাস করেন।

কিছু সংখ্যক লোক মি'রাজকে শারীরিক মনে করেন না। স্বপ্নের ঘটনা বা আধ্যাত্মিক কিছু বলে মনে করেন। শারীরিক মি'রাজ তাঁদের কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি হল তাঁদের শারীরিক মি'রাজে বিশ্বাসের প্রতিবন্ধক।

কুরআন মজীদের সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে মি'রাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সূরা আন্-নাজমের প্রথম থেকে অষ্টাদশ আয়াত পর্যন্তও এর বর্ণনা আছে। হাদীস শরীফেও মি'রাজের বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। তার মধ্যে সব থেকে বিশ্বস্ত রেওয়াতের উপর নির্ভর করে মি'রাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি।

সূরা বনী ইসরাইল এর প্রথম আয়াত : "পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর 'আবদ্কে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য রাত্রিতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত-যার পরিবেশ তিনি করেছেন পূত, নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃষ্ট শ্রোতা, প্রকৃষ্ট দ্রষ্টা।"

"অস্তমিত নক্ষত্রের শপথ! তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নন, বিপথগামীও নন এবং তিনি নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু বলেন না। [এ কুরআন] ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তাঁকে শিক্ষাদান করেন অসীম শক্তির অধিকারী, [হযরত জিব্রাঈল] তিনি নিজ আকৃতিতে স্থির হলেন এবং তিনি আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছলেন।

অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী হলেন-অতি নিকটবর্তী, ফলে তাঁদের মধ্যে মাত্র দুই ধনুকের ব্যবধান রইল। তখন আল্লাহ্ তাঁর আবৃদের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন। যা তিনি দেখেছেন তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি। তিনি যা দেখেছেন তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন প্রান্তবর্তী বদরিকা বৃক্ষের নিকট, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান, যখন বৃক্ষটি যা দিয়ে শোভিত হওয়ার তা দিয়ে শোভিত ছিল, তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন।" [আন্-নাজ্ম : ১-১৮]

সূরা আন্-নাজমে 'শাদীদুল কউওয়া'কে অনেকে আল্লাহ্ তা'আলা বলে মনে করেন অবশ্য সূরা তাকবীর ১৯ থেকে ২৪ আয়াতে যে বর্ণনা আছে, সেখানে ফেরেশতা জিব্রাঈলই সুস্পষ্ট। আমি এখানে তার তরজমা দিচ্ছি ঃ

'নিশ্চয়ই এ এক মহাসম্মানাস্পদ দূতের ভাষণ, যিনি বিশ্ব-অধিপতির দরবারে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, যিনি সর্বমান্য একান্ত বিশ্বাসভাজন-তোমাদের সাথী উম্মাদ নন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে [ঐ দূতকে] মেঘ-নির্মুক্ত চক্রবালে দেখেছিলেন। বস্তুত তিনি গায়েবী তত্ত্বের প্রচারে কুণ্ঠিতও নন।'

এবার আমরা সহীহ্ হাদীস থেকে মি'রাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছি ঃ

মি'রাজ সংঘটিত হয় রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পঞ্চাশ বছর বয়সে। এই সময়টাই ছিল তাঁর জীবনে সব থেকে সংকটময়। চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেছেন, ইন্তেকাল করেছেন তাঁর সহধর্মিনী-তাঁর উপর সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারিণী বিবি খাদীজাতুল কুবরা। কাল কাটাচ্ছেন তিনি নানা রকমের সংকটের মধ্য দিয়ে, শত্রুতার মধ্য দিয়ে। তায়েফে ইসলাম প্রচার করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন বিফল মনোরথ হয়ে।

এই যখন অবস্থা, সে সময়ে তিনি একদিন রাতে [রজব মাসের ২৭শে] ঘুমিয়েছিলেন কা'বা শরীফের চত্বরে। ঘুম ঘোরে ডাক শুনলেন, 'ইয়া মুহাম্মদ!' তিনি জেগে ওঠলেন। দেখলেন, তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ফেরেশ্তা জিবরাঈল (আঃ) আর একটু দূরে ডানাবিশিষ্ট ঘোড়ার মত একটা বাহন। ফেরেশ্তা জিবরাঈল তাঁকে আলিঙ্গন করে 'বুরাক' নামক এক বাহনে আরোহণ করার অনুরোধ জানালেন।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) 'ওযু' করে বুরাকে চড়লেন। বুরাক নিমেষের মধ্যেই বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে হাযির হল। বায়তুল মুকাদ্দাস রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পূর্ববর্তী অনেক নবীর স্মৃতি বিজড়িত। হযরত জিবরাঈলের (আঃ) অনুরোধে তিনি এই মসজিদে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে আবার বুরাকে চড়লেন।

এবার বুরাক গিয়ে হাযির হল প্রথম আসমানের দুয়ারে। ফেরেশ্তা দরজা খোলার ইঙ্গিত দিতেই ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, 'আপনি কে এবং আপনার সঙ্গী কে।' আর সামনে হাযির হলেন আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)। রাসূলুল্লাহ্ একে একে সপ্তম আসমান পর্যন্ত গেলেন। দ্বিতীয় আসমানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়

হযরত ঈসা (আঃ)-এর, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আঃ), চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আঃ), পঞ্চমে হযরত হারুন (আঃ), ষষ্ঠে হযরত মূসা (আঃ) এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে। সকলেই রাসূলুল্লাহ্‌কে জানালেন খোশ আমদেদ।

সপ্তম আসমানের পরে জিবরাইল (আঃ) আর অগ্রসর হতে পারলেন না। কিন্তু হযরত এগিয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত। তিনি নিরস্ত হলেন না। একাই তিনি চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি বায়তুল মামুর পর্যন্ত গেলেন। সেখানে ফেরেশ্‌তারা প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌র গুণগানে মশগুল। এ স্থান এক অপূর্ব জ্যোতিতে ভরপুর-চিরস্নিগ্ধ, চির-মনোরম। এখানে এসে হযরত (দঃ) লাভ করলেন আল্লাহ্‌র নৈকট্য।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য কী, তা ভাষায় বুঝানো মুশকিল। কুরআনের ভাষায় বলতে গেলে রাসূলুল্লাহ্‌কে তাঁর নিদর্শন দেখালেন ঃ 'লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা... ।' রাসূলুল্লাহ্‌ সৃষ্টি রহস্য জানলেন-সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে তিনি আরো ভাল করে জানলেন। কথিত আছে, একটা পর্দার আড়াল থেকে আল্লাহ্‌ রাসূলুল্লাহ্‌কে তাঁর নূর দেখান। উভয়ের মধ্যে অনেক কথা হয়।

এই মি'রাজের রাতেই সালাত ফরয হয়। মু'মিনদের জন্য নবী মুহাম্মদ (দঃ) এই সালাতের সওগাত নিয়ে আসেন।

আমাদের জীবনে মি'রাজের স্বাদ আমরা পেতে পারি, যদি আমরা সালাত কায়েম করি। রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলেছেন, 'আস্‌সালাতু মি'রাজুল মু'মিনীন'। প্রকৃত মনোযোগের সঙ্গে সালাত আদায় করলে মি'রাজে রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) আল্লাহ্‌র যে নৈকট্য লাভ করেছিলেন, আমরা তাঁর কিছুটা অবশ্যই পেতে পারি।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর জীবনের যে সংকটময় মুহূর্তে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল, আমাদের জীবনের এ রকম সংকটময় মুহূর্তে যদি আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে পারি, তা হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) মি'রাজে যে স্বস্তি ও শান্তি পেয়েছিলেন, আমরাও তার অন্তত কিছুটা পেতে পারি।

প্রকৃত অর্থে সালাত কায়েম করতে হবে। আমরা সালাতে দাঁড়াবার সময় বলি 'ইন্নী ওয়াজ্জাহতু... মিনাল মুশ্‌রিকীন'-'আমি তাঁরই দিকে মুখ করছি সুদৃঢ়ভাবে, যিনি আসমান যমীনকে স্থাপন করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই।'

এটা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'য়া। আর এই দোয়া তিনি করেছিলেন যখন তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিপালকের সন্ধানী। তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিপালকের খোঁজে। তারকা দেখে তিনি মনে করেন, এই তাঁর প্রতিপালক। তারপর চাঁদ দেখে মনে করলেন যে, তারকা নয়, চাঁদই তাঁর প্রতিপালক। চাঁদ যখন ডুবে গেল, সূর্য উঠলো, তিনি মনে করলেন চাঁদ নয়, সূর্যই তাঁর প্রতিপালক। সূর্য যখন ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন, না, এ সূর্য আমার প্রতিপালক নয়, আমার প্রতিপালক হলেন তিনি, যিনি এই আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রকৃত সালাত কায়েম করার জন্য এই 'ইন্নী ওয়াজ্জাহতু' এর মূল্য খুব বেশী। সালাত তখনই সার্থক হবে যখন আমরা দুনিয়ার সব কিছু থেকে মনকে ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে মন নিবিষ্ট করতে পারব।

আর একটা কথা, মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর সংকটময় সময়ে। আমাদের সংকটময় সময়েও যদি আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর অনুসরনে আল্লাহ্‌র উপর সঠিকভাবে তাওয়াক্‌কুল করতে পারি, তাহলে পরিত্রান আমরাও পেতে পারি, তাওয়াক্‌কুল-নির্ভরতা' নিশ্চয়ই। কিন্তু তার পেছনে প্রয়োজন আরো কিছু। সেটা হল সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির চেষ্টা-সম্পূর্ণভাবে তাঁর আহ্‌কাম মেনে চলা।

মি'রাজ শারীরিক না আধ্যাত্মিক-এই নিয়ে যে প্রশ্ন, তার মূলে যে জড়বাদী দৃষ্টি ভঙ্গী, তা আগেই বলেছি। বাস্তব-যৌক্তিক এসব কথা সব সময়ই কিছু কিছু লোক ব্যবহার করেছেন এবং বাস্তবতার দোহাই দিয়ে অনেক কিছুকেই অবিশ্বাস করার চেষ্টা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর আমলেও নাকি দু একজন মুসলমান মি'রাজকে শারীরিক মনে না করে আধ্যাত্মিক মনে করতেন। কিন্তু তাঁদের কথাকে বিশেষ গ্রাহ্য করাটা খুব বাস্তব সম্মত নয়। কারণ মি'রাজ সম্পর্কে তাঁদের সাক্ষ্য কোন দেশের সাক্ষ্য আইনে [Law of Evidence] টেকে না।

তার পরে দেখা যাক বিজ্ঞানের কথা। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে বস্তুকে [matter] যে রকম জড় বলে মনে করা হত, তাতে হয়ত শারীরিক মি'রাজ সম্পূর্ণভাবে বাস্তববাদীর পক্ষে বিশ্বাস করতে একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু তার পরে আমরা বস্তু সম্পর্কে যে ধারণা পাচ্ছি, তাতে আর বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে শারীরিক মি'রাজ বিশ্বাস করতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

মি'রাজ যে শারীরিক তার প্রমাণ কুরআন মজীদেরই মি'রাজের আয়াতে আছে। সেখান আল্লাহ্‌ সম্পর্কে যে 'আসমাউল হুসনা' আল্লাহ্‌র বিশেষণ [প্রকৃষ্ট শ্রোতা ও প্রকৃষ্ট দ্রষ্টা] ব্যবহার করা হয়েছে, তাতেই শারীরিক মি'রাজের ইঙ্গিত আছে। আল্লাহ্‌ তাঁর আবদকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্‌সা পর্যন্ত ভ্রমণ করালেন। স্বভাবতই এর পরে আল্লাহ্‌র শক্তি প্রকাশক কোন গুণবাচক নাম থাকত। কিন্তু তা না থেকে থাকছে, আল্লাহ্‌ সব কিছু শুনেন ও সব কিছু দেখেন। আল্লাহ্‌র শোনা ও দেখা গুণের কথা বলা হচ্ছে। তার অর্থ কী? এর কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌কে কাছ থেকে কাছাকাছিভাবে-নিকটতমভাবে শুনবেন, তাকে দেখবেন কাছাকাছিভাবে। সে জন্যই মি'রাজের আয়াতে আল্লাহ্‌র শক্তি প্রকাশক কোন গুণের কথা না বলে বলা হয়েছে তাঁর শ্রবণ ও দর্শন গুণের কথা। এটাই শারীরিক মি'রাজের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় কি?

বিশ্ব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সূফিবাদী সমাধান

●এ. এন. এম. এ. মোমিন●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩। **মতাদর্শ/ ধর্মীয় বিশ্বাস সমূহের দর্শন ও তাত্ত্বিক সমস্যা:** বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা অন্য সকল ধর্ম মতাদর্শকে ভুল বা বিভ্রান্তিকর বলে মনে করে থাকেন। কেউ কেউ আবার মনে করেন যারা ভুল মতাদর্শে বিশ্বাসী তাদের পৃথিবীতে টিকে থাকার অধিকারই নেই। এটাই বিশ্বে ধর্মীয় সংঘাত বা ধর্মীয় বিরোধিতার বা ধর্ম নিয়ে হানা হানির মূল কারণ। এর বিপরীতে সূফি মতবাদ বিভিন্ন ধর্মমতাদর্শ সম্পর্কে এ শিক্ষা দেয় যে, সব প্রচলিত বড় ধর্মই এক আল্লাহর নিকট থেকে আগত। যার যার ধর্ম তার কাছে সম্মানের বিষয়। এ ব্যাপারে ভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের বা ধর্মীয় তত্ত্বের বা তথ্যের ব্যাপারে কোন সমালোচনা করার অধিকার নেই। বরং ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কারো সাথে কোন ধরণের বৈষম্য মূলক আচরণ করাই অধর্ম বা অন্যায় বা অসমর্থন যোগ্য। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে: যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকে (ভিন্ন ধর্মাবলম্বী)। তাদের গালি দিওনা তাহলে তারা না বুঝে আল্লাহকে গালি দেবে (সূরা আন আ'ম-১)।

৪। **মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচার মানবীয় জীবন ধারণের উপকরণাদির ও জীবন যাত্রার মান:** এ সমস্যা গুচ্ছের সমাধান সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য যে রায় ঘোষণা করেছে তা হলো, "হে ঈমানদারগণ তোমরা সর্বদাই ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। এবং নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার জন্য সত্যের সাক্ষী হিসাবে পেশ কর। যদিও তা নিজের, নিজের পিতা মাতার কিংবা নিজের আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধেও যায়। সে ধনী হোক বা গরীব হোক আল্লাহই সবার অভিভাবক।" (সূরা নিসা-১৩৫)।

৫। **বিশ্ব ব্যবস্থাপনা: সম্পদ, শক্তি পরিবেশ:** বর্তমানে আল্লাহ প্রদত্ত এসব সম্পদ বৃহৎ শক্তিবর্গের কুক্ষিগত রয়েছে। এসব দেশ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের ন্যায্য অধিকার থেকে সাধারণ জনগোষ্ঠিকে বঞ্চিত করছে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, "ঈমানদার লোককে যদি ভূপৃষ্ঠে শাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করা হয়, তারা নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে যথাযথভাবে বন্টন করে দেবে, আর লোকদের সৎ ও ন্যায় কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায়,অসৎ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (সূরা হজ্ব)

এ নির্দেশনার মূল স্পিরিট হলো অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে নৈতিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে একটিকে অপরটির সাথে জড়িত করা। তাছাড়া এতে অর্থনৈতিক সমস্যাকে শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা বস্তুগত লাভ ক্ষতির মাধ্যমে সমাধান করার পরিবর্তে সামগ্রিক জীবন বিধানের ফর্মূলায় ফেলে সমাধান করা হয়েছে।

৬। **রাজনৈতিক কাঠামো:** আন্তর্জাতিক সংগঠন সমূহ/ প্রতিষ্ঠান/ নিয়ন্ত্রক/ আইনকানুন বিধি বিধান

জাতিসংঘের হালনাগাদ কর্মসূচী অনুযায়ী Global Tyranny Step by Step (by William Jasper) পুস্তকে প্রশ্ন রাখা হয়েছে, কোন্ সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে এ বিশ্ব সংস্থা সে সব ক্ষেত্রে কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে হস্তক্ষেপ না করতে পারে? এর মধ্যে জীব বৈচিত্রের হানি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন বিপন্ন হওয়া সহ অন্যান্য যে সব গোলমালের উৎস রয়েছে তা হল– জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি, মাদকদ্রব্য সেবন, ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্যের হার বৃদ্ধি, দারিদ্র দূরিকরণ, রোগ-শোক, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, খরা, বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে ছিদ্র এবং যে জিনিস বা বিষয় কল্পনা করা যায় সবই জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এটি এমন এক সংস্থা যা নিপুণতার সাথে সুকৌশলে আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীরা তাদের বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজে ব্যবহার করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃতপক্ষে কোন "আইন" নয়। এ আইন তার মৌলবিধি ও শাখা প্রশাখার দিক দিয়ে পুরোপুরিভাবে শক্তিমান রাষ্ট্রসমূহের খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল। ঐ সব দেশ আপন ইচ্ছাগুলোর স্বার্থের তাগিদে আইন তৈরি করে ও তার রদবদল ঘটায়। আর যে আইন শক্তিমান দেশগুলো পছন্দ করেনা তা শেষপর্যন্ত আইনই থাকেনা।

চুক্তি, সন্ধি, রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বা আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কীয় ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনা হলো, "তারা যতক্ষণ চুক্তি মেনে চলবে, ততক্ষণ তোমরাও মেনে চলো। আল্লাহ সংযমশীল (পরহেজগার) লোকদের ভালবাসেন। কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকদের সাথে কী করে চুক্তি করা যাবে, যারা

তোমাদের উপর নিশ্চিত জয়লাভ করলে আত্মীয়তার (বিশ্ব পরিবার, তথা সকল মানুষই অভিন্ন পিতা-মাতা-সন্তান) মর্যাদা দেয়না, ওয়াদা-অঙ্গীকারেরও না। তারা তোমাদের মিষ্টি বাক্যে খুশি রাখার চেষ্টা করে কিন্তু মনে মনে তারা তা অগ্রাহ্য করে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই দুষ্কৃতিকারী।

... তারা যদি ... তোমাদের ধর্মের উপর আঘাত করে (ধর্ম শুধু নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতে বাধা দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়) বরং পারিবারিক বন্ধন, বেপর্দা, বেহায়াপনা, নিষিদ্ধ সুদভিত্তিক হারাম অর্থ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পরিশোধনও ধর্মের আওতাভুক্ত। তাহলে এ ধরণের কুফরী নেতৃবৃন্দের সাথে সমঝোতার পথ পরিহার করো। তাদের সম্পর্ক ও প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা সংগত নয়।" (সূরা তওবা ৭,৮,১২)

৭। **জনসংখ্যাঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধি-স্থানান্তর গতি প্রকৃতি রিফিউজি সমস্যা ইত্যাদি

এ গুচ্ছ সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতির গতি প্রকৃতির জটিলতা ও অস্বাভাবিকতা এ ধরণের সমস্যা সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী। এ ব্যাপারে দৃষ্টি ভংগী, জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআনের কয়েকটি নির্দেশনা ও মানবীয় জীবন যাত্রার মূল সূত্র সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হচ্ছে, "নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা জীবিকাকে প্রশস্ত ও সংকীর্ণ করেন, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ও দ্রষ্টা। এবং অভাবের আশংকায় তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা। আমি তাদের ও তোমাদের জীবিকা প্রদান করি। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মহাপাপ এবং ব্যভিচারের নিকটেও যেওনা তা অবশ্যই অশ্লীল কর্ম এবং অতি নিকৃষ্ট পথ।

ইয়াতিম (অসহায়) যতক্ষণ না বয়ঃপ্রাপ্ত হবে উত্তম পন্থা ব্যতীত তার সম্পদের নিকটবর্তী হয়োনা। প্রতিশ্রুতি পালন কর, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।" (সূরা বনি ইসরাইল, ৩০,৩২,৩৫)।

৮। **জাতিগত ও গোত্রীয়ঃ** জাতিগত সমস্যা বর্ণ বৈষম্য গোত্র নিধন ইত্যাদি কোন বৈধ বা যুক্তি সংগত কারণ ব্যতীত নির্বিচারে শুধুমাত্র বর্ণ, জাতিগত বা গোত্রীয় অথবা ভিন্ন ধর্মীয় হওয়ার কারণে নর নারী হত্যা করা একটি জঘন্য অপরাধ। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, "কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি (সে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান যাই হোক না কেন) কে হত্যার প্রতি বিধান বা জমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ ছাড়া হত্যা করল সে যেন সারা পৃথিবীর সমস্ত লোককে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর হাত থেকে অন্য মানুষকে রক্ষা করল সে যেন সারা পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবিত করল।" (মায়িদা-৩২)।

সুতরাং এ ভয়াবহ অপরাধ থেকে সবারই বিরত থাকা উচিত।

৯। **যান্ত্রিক বিপ্লবঃ** বিজ্ঞান/ প্রযুক্তি/ পরিবহন যাতায়াত ব্যবস্থাঃ ১৭৮০ সাল থেকে বিশ্বে যে প্রযুক্তিগত বিপ্লব সাধিত হয় তা ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব হিসাবে অভিহিত হয়। এ বিপ্লবের ফলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বিশ্ব পরিবহন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এবং এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য, মতবাদ সৃষ্টি হয়। এ সব বিষয়ে অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য থাকলেও সকল চিন্তাধারার প্রধান আক্রমণস্থল হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম। আর এ সব মতবাদের মধ্যে ডারউইনবাদ ব্যাপকভাবে সমাজে গৃহীত হয়। যার শাখা প্রশাখায় বহু বৈজ্ঞানিক ভুল ও বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব ও তথ্য থাকলেও এ মতবাদ এক ধরণের বৈজ্ঞানিক ছত্রছায়ায় পৃথিবীর ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদ সকল মতবাদেরই তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে ডারউইনবাদকে গ্রহণ করা হয়। ফলে যে কোন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি বুঝে না বুঝে, জেনে না জেনে সম্পূর্ণ অন্ধভাবে ডারউইনের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক চিন্তা ধারার অনুসারী হয়ে উঠে। তাছাড়া বিশ্বের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নিত্য নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে যে সব বস্তু নির্মাণ বা সৃষ্টি করে তা মানুষের জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে আরাম আয়েশ, কলা কৌশল ও বিনোদন সৃষ্টি করে মানব সমাজকে এক রকম দিশেহারা করেছে। ফলে মানুষের মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়ে মানুষের হৃদয় থেকে দয়া, মায়া, প্রেম ভালবাসা তিরোহিত হতে চলেছে। এহেন পরিস্থিতিতে ধর্মীয় মূল্যবোধে অবিচল থাকা এক দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ মানবীয় তাবত কর্মকাণ্ডের মূল হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে লাভ ও লোভ যাকে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরণের উপাস্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এরশাদ হচ্ছে "তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার আত্মাভিলাষকে (প্রবৃত্তি-লাভ-লোভ) নিজ উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি ধারণা কর তাদের অধিকাংশ শুনে ও বোঝে (কখনই না) তারা তো সব চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তারা (তাদের অপেক্ষা) অধিক পথভ্রষ্ট।" (সূরা ফোরকান, ৪৩, ৪৪)। "বরং তুমি তাদের ও তাদের পিতৃপুরুষদের ভোগ বিলাসের সামগ্রী দান করেছিলে, ফলে তারা তোমার (আল্লাহর) স্মরণকে বিস্মৃত হয়ে ছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।" (সূরা ফোরকান,

১৮) এ কারণেই ধ্বংসে বা ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার জন্য এ ধরনের জীবন দর্শন পরিহার করা অপরিহার্য।

১০। **দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নঃ** রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্যপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের অনুপস্থিতি যার কারণ হিসাবে নিত্য নতুন মতবাদের ভিত্তিতে নিউকলোনিয়ালিজম, নিউমার্কেন্টাইলিজম, নিউ ইম্পিরিয়ালিজম, রাষ্ট্রীয় সীমানা ভিত্তিক নির্ভরতা বেড়েছে। বিদেশী ঋণ, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে।

নগরায়ন, ভারসাম্যহীন ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে ধনী দরিদ্রের ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে যে কারণে সমগ্র বিশ্ব একটি জুলুম, অত্যাচার, হানাহানি, খুন, সন্ত্রাস, যুদ্ধ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণগত বৈষম্য বিরোধ ও পরস্পর পরস্পরের জুলুম ভিত্তিক শাসন ও শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এর বিপরীতে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হচ্ছেঃ

(তোমরা) পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী আর তোমাদের ডান হাতের অধীন দাসদাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারী ও দাম্ভিককে ভালবাসেন না। (নিসা-৩৬)।

বর্তমান বিশ্বের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে যে সব কারণকে চিহ্নিত করা যায়, তা হলো উৎকোচ বা ঘুষ বা দুর্নীতি (সূরা বাকারা, ১৮৮), ব্যক্তি সমষ্টি নির্বিশেষে আত্মসাৎ করা (আল বাকারা-১৮৩ ও আলেইমরান, ১৬০) চুরি (সূরা মায়িদা, ৮১) এতিমের মাল অন্যায়ভাবে তসরূফ (সূরা নিসা, ১০), ওজনে কম করা (আল মুতাফফিফীন ৩)। চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণ সমূহের ব্যবস্থা তথা যৌন উদ্দীপক সাহিত্য, সিনেমা, নাটক, অশ্লীল গান বাজনা, নাচ (আন নূর, ১৯) বেশ্যাবৃত্তি ও দেহ বিক্রয় লব্ধ অর্থ (আন নূর,৩৩) মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসায় ও মদ পরিবহন (মায়িদা, ৯) জুয়া, ফটকাবাজি ও এমন সব উপায় উপকরণ যে গুলোর মাধ্যমে নিছক ঘটনা চক্রে ও ভাগ্যক্রমে একজন লোকের নিকট সম্পদ হস্তান্তরিত হওয়া (মায়িদা, ৯০) ভাগ্য গননা বা অনুরূপ পদ্ধতিতে অর্থ আয় (হজ্ব, ২৭৮) সুদ বিষয়ক সকল কার্যক্রম (বাকারা, ২৭৫, ২৭৮, ২৮০ আলে ইমরান, ১৩০)।

বিশ্ব বিবেক ও অর্থনীতি এ সব নীতি ও ধর্ম গর্হিত কাজ কর্ম থেকে মুক্ত হলেই কেবলমাত্র প্রকৃত স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব।

উপসংহারঃ সূফিবাদীদের মতে মানব মনের গতানুগতিক শক্তি বলে বা সহজ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও খণ্ডিত বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞানের সন্ধান না করে মরমী অভিজ্ঞতা ও অতিন্দ্রিয় সত্তার সাহায্যে পরমার্থিক জ্ঞানের সন্ধানের মাধ্যমে শাশ্বত সত্যের প্রত্যক্ষ প্রতিতী অর্জন এবং এক ধরণের প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তির সাহায্যেই কেবল পরতাত্ত্বিক ও পরমার্থিক ঐশী সন্ধান পাওয়া সম্ভব। আর এ ঐশী জ্ঞানের মাধ্যমে পার্থিব সকল প্রকার সমস্যা দূর করা যায় মর্মে সূফি সাধকগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে থাকেন। আল্লাহ সূফিদের এ জ্ঞান অর্জনে আমাদের সফলতা দান করুন। যাতে আমরা সমগ্র বিশ্বের পার্থিব সকল সংকট সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সাথে সাথে মহান ঐশী সত্তার সন্ধান লাভ করতে পারি। এটাই হোক আমাদের প্রত্যাশা। আমিন ছুম্মা আমিন।

সূফি উদ্ধৃতি

■ আল্লাহকে পাওয়ার সত্তরটি ধাপ তার মধ্যে সর্বোচ্চ ধাপ তাওয়াক্কুল আর সর্বনিম্ন ধাপ হল আল্লাহকে স্বীকার করা।

■ তিন বস্তুর প্রতি মহব্বত মানুষের ক্ষতির কারণ। যথা ১. নফসের প্রতি, ২. জীবনের প্রতি এবং ৩. ধন-দৌলতের প্রতি। বস্তুত্রয়ের একটিও কিন্তু মানুষের নিজের নয়; বরং প্রত্যেকটির প্রকৃত মালিক আল্লাহ। যেমন নফস হল আল্লাহর দাস। জীবনের মালিকও আল্লাহ। তারপর ধন-সম্পদ তাও মানুষের নয়, তারও প্রকৃত অধিকারী আল্লাহ।

■ মানুষ সত্যনিষ্ঠ হলে নেক কাজ করার পূর্বেই তার আস্বাদ ভোগ করে। আর বিশুদ্ধতা এমন এক বস্তু, ইবাদতের স্বাদ থাকে তার ভিতরেই।

– হযরত আবু তুরাব বলখী (রহঃ)

নবীয়ে করিম (দঃ) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা

● মাওলানা গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান ●

আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মূলতঃ সাহায্য প্রার্থনা করা, বিপদের সম্মুখীন হয়ে তা থেকে নিষ্কৃতির জন্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই শরণাপন্ন হতে হয়। তিনিই সাহায্যকারী তিনিই প্রার্থনা কবুলকারী এবং তিনি বিপদ থেকে উদ্ধারকারী। এই মর্মে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– "এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন তোমরা আমাকে আহ্বান করো আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেব।" তাই যদি কোন ব্যক্তি "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ নিজ থেকে লাভ-ক্ষতি করতে পারে" এই আক্বিদা পোষণ করে কোন মাখলুকের সাহায্য প্রার্থনা করে, বিপদে-আপদে তার শরণাপন্ন হয়, তাহলে সে শিরক করল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের জন্য একে অপরের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণের জন্য কারো শরণাপন্ন হওয়া জায়েজ রেখেছেন। এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যদি কেউ কারো নিকট প্রার্থনা করে সে যেন সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করে। বিপদে পড়ে যদি কেউ উদ্ধার করার জন্য কউকে আহ্বান করে সে যেন বিপদগ্রস্থের আহ্বানে সাড়া দেয়। এ বিষয়ের সমর্থনে অসংখ্য হাদীস শরীফ রয়েছে। যে গুলো পীড়িত মজলুম, বিপদগ্রস্থ ও অভাবীদের সাহায্য সহযোদিতা করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। আর নবী করীম (দঃ) হচ্ছেন সেই মহান সত্তা যাঁর নিকট যে কোন বিপদে আপদে সাহায্য চাওয়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পরে আর কারো নিকট সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে তিনিই (দঃ) অধিকতর হকদার। কিয়ামত দিবসের চেয়ে করুণ এবং কঠিন অবস্থা আর কী হতে পারে? যেদিন মানুষ শেষ বিচারের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকবে অসহনীয় গরম ও ভীড়ের মধ্যে থাকবে এবং সবার গলা পর্যন্ত ঘামের প্লাবন হবে এমন কঠিন মুহূর্তে প্রত্যেক মানুষই পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর প্রিয় হাবীব আমাদের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর শরণাপন্ন হবে। যার বর্ণনা স্বয়ং রাসূল (দঃ) দিয়েছেন। আর বুখারী শরীফে হাদীস শরীফটি বর্ণিত হয়েছে। কিয়ামত দিবসের কঠিন মুহূর্তে যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সব মানুষ মিলে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সব নবীর শরণাপন্ন হবে। সবাই নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করবে। পরিশেষে নিরূপায় হয়ে নবী করীম (দঃ) এর নিকটে আসবে। তখন তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলবেন আমি তোমাদের এই কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে বলব। এই বলে তিনি আল্লাহর সম্মুখে সিজদায় পড়বেন। আল্লাহ বলবেন, হে মুহাম্মদ (দঃ) সিজদা থেকে শির উঠাও। অতঃপর যা ইচ্ছা চাও তোমাকে তা দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। এটি বুখারী শরীফে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের সার সংক্ষেপ।

সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের বিপদে আপদে, বালা-মুসিবতে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর (দঃ) সাহায্য সহযোগিতা চাইতেন। তাঁর নিকট তাদের বিভিন্ন সমস্যা এবং দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা দিতেন। এবং তা থেকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য চাইতেন। কিন্তু তাঁদের চাওয়ার মধ্যে তাঁর থেকে সাহায্য সহযোগিতা কামনার মধ্যে একটি দিক বিশেষভাবে শিক্ষনীয় ছিল সেটা হচ্ছে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর ব্যাপারে এই আক্বিদা পোষণ করতেন যে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন বিভিন্ন দুঃখ দুর্দশায় সহযোগিতা করবেন এগুলো সব আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি দ্বারা। তাঁর নিজ ক্ষমতা বলে নয়। কারণ প্রকৃত লাভ ক্ষতি করার ক্ষমতা একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই জন্য সংরক্ষিত। তিনি যাকে যতটুকু অনুগ্রহ করেছেন সে ততটুকু দ্বারা অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। নিজ ক্ষমতাবলে নয়। এ ধরণের সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের কোন বাধা নেই বরং তা শরীয়ত সম্মত। আর এ কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় অনুগ্রহ এসেছে নবী করীম (দঃ) এর মাধ্যমে। তিনি নিজেই বর্ণনা দিয়েছেন "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর দাতা এবং আমি তা বন্টন কারী।"

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ভুলে যাওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি একদা এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট অভিযোগ করলেন তিনি হাদীস শরীফ শুনে মনে রাখতে পারেন না। খুব শীঘ্রই তা ভুলে যান। এই বিপদ থেকে নিষ্কৃতির জন্য তিনি তাঁর সাহায্য কামনা করলেন। হাদীস শরীফটি নিম্নরূপ:

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট থেকে অসংখ্য হাদীস শুনি কিন্তু তা

ভুলে যাই মনে রাখতে পরিনা। আমি চাচ্ছি আপনার মুখ নিঃসৃত বাণী যেন আর কখনো না ভুলি। তখন রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোমার চাদর বিছিয়ে দাও। অতঃপর তিনি (আবু হুরায়রা (রাঃ)) তা বিছিয়ে দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁর পবিত্র হস্তে শূণ্য থেকে কী যেন ঐ চাদরের মধ্যে রাখলেন অতঃপর বললেন চাদর ভাঁজ করে ফেল। তিনি তা ভাঁজ করে ফেললেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন এরপর কোনদিন আর কিছু আমি ভুলিনি। (বুখারী শরীফ-কিতাবুল ইলম)

এখানে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (দঃ) এর কাছ থেকে ভুলে যাওয়ার মত ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছেন। এটা করার শক্তি আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। এতদসত্ত্বেও তার চাওয়ার উপর নবীজী তাকে নিন্দাও করলেন না মুশরিকও বললেন না। আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট কোন মু'মিন যখন কোন কিছু চান এবং এ চাওয়ার মধ্যে সে এ উদ্দেশ্য করেনা যে যাঁর নিকট চাওয়া হয়েছে তিনি তার জন্য তা সৃষ্টি করে দেবেন। আর এ ক্ষেত্রে সে এ আক্বিদাও পোষণ করেনা যে, তিনি নিজ থেকে দান করবেন বরং এ ক্ষেত্রে তার আক্বিদা হবে যাঁর নিকট চাওয়া হয়েছে তিনি যেহেতু আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত অতএব আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই তিনি সাহায্য সহযোগিতা করবেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁর চাহিদা পূরণ করেছেন, আর এ ঘটনার বর্ণনায় এ রূপ বর্ণনা নেই যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) তার মনষ্কামনা পূরণে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন বরং তিনি তার চাওয়ার প্রেক্ষিতে শূণ্য থেকে কী যেন তাঁর পবিত্র হাতে নিয়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর কাপড়ে রেখেছেন। তারপর তিনি (আবু হুরায়রা (রাঃ)) তা বন্ধ করে স্বীয় বুকে লাগালেন অত্যন্ত যত্ন সহকারে নিজের কাছে রাখলেন আর হুজুর (দঃ) কর্তৃক এ রূপ করার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ আসল যা আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সমস্যা দূরিভূত হওয়ার কারণ হল। আর হুজুর (দঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) এর চাওয়ার প্রেক্ষিতে এ রূপও বলেননি যে, "তোমার কী হয়েছে আমার নিকট কেন চাচ্ছ আল্লাহর নিকট চাও আমার চাইতে তিনি তোমার নিকটবর্তী?" কারণ এ বিষয়টি সবারও জানা বিপদে আপদে সুখে-দুঃখে সমস্যা সমাধানে আল্লাহরই শরণাপন্ন হতে হবে, সবকিছু তাঁরই হাতে অন্য কারো কাছে চাওয়া মানে হচ্ছে তিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সুচীত হয়েছে সেজন্য তাঁর নিকট চাওয়া।

হযরত কাতাদাহ (রঃ) তাঁর চক্ষু ভাল হওয়ার জন্য নবী করীম (দঃ) এর সাহায্য চেয়েছেন:

হযরত কাতাদাহ ইবনে নোমান (রাঃ) চোখে আঘাত পেয়েছিলেন। তাতে তাঁর চোখ ঝুলে পড়েছিল। উনার আত্মীয় স্বজনরা তা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাইলে তিনি বললেন হুজুর (দঃ) থেকে নির্দেশ নিতে হবে। অতঃপর এ ব্যাপারে হুজুর (দঃ) এর নির্দেশ চাইলে তিনি বললেন, "না চোখ বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।" তিনি নিজ হস্তে তা যথাস্থানে সংযোজন করে দিলেন। এবং এটার উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে চক্ষুটি পূর্বের চেয়েও আরো ভাল হয়ে গেল।

ঘটনাটি ইমাম বগভী ইমাম আবু ইয়ালা, ইমাম দারে কুতনী, ইমাম ইবনে শাহীন ও ইমাম বায়হাকী (রঃ) দালায়েলুন্নাবুয়াত কিতাবে বর্ণনা করেন। ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী আল আসবাত কিতাবে ইমাম হায়ছামী মজমাউল জাওয়ায়েদ কিতাবে ও ইমাম সুয়ূতী খসায়েসুল কুবরা নামক কিতাবে বর্ণনা করেন।

হযরত মুয়াজ (রাঃ) হাত ভাল হওয়ার জন্য রাসূল (দঃ) এর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন: বদর যুদ্ধে ইকরামা বিন আবু জাহল হযরত মুয়াজ ইবনে আমর ইবনে জুমুহ (রাঃ) এর কাঁধে সজোরে আঘাত করেন, হযরত মুয়াজ বলেন সে আমার হাতে তরবারী দ্বারা আঘাত করল। ফলে আমার শরীরের এক পার্শ্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে চামড়ার সাথে ঝুলে রইল। এমতাবস্থায় আমি প্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়া হাতটিকে পিছনে বেঁধে রেখে পুরোদিন যুদ্ধ করলাম, অতঃপর এই হাত দ্বারা যখন আমি খুব বেশি ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম তখন পায়ের নিচে চেপে ধরে হাতটিকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম।

এর পরবর্তী ঘটনা ইমাম কুসতুলানী বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ মাওয়াহিব আল লাদুনিয়া কিতাবে এবং ইমাম কাজী আয়াজ শেফা শরীফে এভাবে বর্ণনা করেন যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি কর্তিত হাতটি নিয়ে হুজুর (দঃ) এর দরবারে আসলেন এবং বললেন "হুজুর! যুদ্ধে আমার হাতটি প্রতিপক্ষের আক্রমণে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।" রাসূল (দঃ) তা দেখে তাঁর থুথু মুবারক দ্বারা হাতটি হযরত মুয়াজের শরীরে সংযোজন করে দেন। ফলে তা আগের চেয়েও উত্তম হয়ে যায়।

এ ঘটনাটি আল্লামা যুরকানীও ইমাম হাকেমের সূত্রে বর্ণনা করেন। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সাহাবায়ে

কেরামরা যখন দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটনের মধ্যে পড়তেন, বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হতেন, আসমান থেকে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে যেত তথা সব ধরণের বিপদে-আপদে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর সাহায্য চাইতেন। যেমন একদা হুজুর (দঃ) জুমার খোতবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে উদ্দেশ্য করে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাদের সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের জীবনধারণের উপায় উপরকণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। (অনাবৃষ্টি, খরার কারণে) অতঃপর আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাদেরকে সাহায্য করেন। তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। এবং সাথে সাথে বৃষ্টিপাত হতে শুরু করল। পরবর্তী জুমা পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টি পড়তে লাগল। তাই লোকটি আবার এসে রাসূল (দঃ) এর নিকট আরজ করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অতিবৃষ্টির কারণে) আমাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে গেছে। জীবনযাত্রা অচল হয়ে গেছে। আমাদের পোষ্য পশুগুলো ধ্বংস হতে চলেছে। তখন হুজুর (দঃ) তাদের এই বিপদ মুক্তির জন্য দোয়া করলেন। সাথে সাথে মদীনার আকাশ থেকে মেঘ সরে যেতে লাগল, বৃষ্টির ধারা অন্যদিকে প্রবাহিত হল। বুখারী শরীফ- কিতাবুল ইসতিসকা, আবু দাউদ শরীফ- কিতাবুস্‌সালাত বাবুল ইসতিসকা, ইমাম বায়হাকী- দালায়েলুন্নবুয়াত এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

উপরোক্ত ঘটনাগুলোতে সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি নবী (দঃ) এর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। এতে হুজুর (দঃ) তাঁদেরকে আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে সরাসরি তাঁর কাছে চাওয়ার কারণে কাফির মুশরিক বলে অভিহিত করেননি আবার এরূপ সাহায্য চাইতে বারণও করেননি। বরং তাঁদের সমস্যা দূর করেছেন। আর এ সমস্ত ঘটনাগুলো নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রসিদ্ধ কিতাব সমূহে বর্ণিত হয়েছে। হুজুর (দঃ) তাঁর জীবদ্দশায় এবং ইন্তিকালের পরে উভয় অবস্থায় তিনি সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্য করেন। তাঁর উভয় অবস্থা উম্মতের জন্য কল্যাণকর যা তিনি হাদীস দ্বারা বর্ণনা করেছেন। "আমার জীবনমৃত্যু উভয়টি" তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

অনেকে বলে বেড়ায় বিপদে আপদে নবীজীর সাহায্য চাওয়া, সমস্যা সমাধানে তাঁর শরণাপন্ন হওয়া এসব কিছু তাঁর (দঃ) জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি ইন্তিকালের পর তাঁর থেকে এসব কিছু চাওয়া না জায়েজ। এর উত্তরে আমরা তাদেরকে বলব কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এটা তাঁর জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত আমরা তা মানি। এতদসত্ত্বেও নবীগণ এবং ওলীগণের কাছে তাঁদের ইন্তিকালের পরেও সাহায্য প্রার্থনা করা আমরা সমর্থন করি। কারণ তারা মৃত নন, তারা তাদের কবর শরীফে স্ব-শরীরে জীবিত। এর প্রমাণ বহনকারী শরীয়তের অসংখ্য বিশুদ্ধ দলীলাদি রয়েছে।

মোদ্দাকথা হচ্ছে, নবী করীম (দঃ) বা আউলিয়া কেরামের নিকট সাহায্য প্রার্থনাকারী কাফের হবে না। কিন্তু হ্যাঁ যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 'সৃষ্টিকারী বা নিজ শক্তি বলে সাহায্যকারী আখ্বিদা পোষণ করে কারো নিকট কিছু চায় সে নিঃসন্দেহে কাফের বলে গণ্য হবে। যাকে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে সাহায্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সৃষ্টিকে বিপদ থেকে পরিত্রাণের সামর্থ দিয়েছেন সাহায্য করার ক্ষেত্রে তাঁদের জীবন-মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

মূলতঃ তাদের জীবন-মৃত্যু হচ্ছে এক জগত থেকে অন্য জগতে প্রস্থান করা। মূলতঃ পরজগতে তাদের এই সাহায্য করার ক্ষমতাটি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আর কাউকে কোন ব্যাপারে উছিলা বা কারণ মনে করতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন আমরা দৈনন্দিন জীবনে জাগতিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক মানুষকে কারণ, মাধ্যম ও উপায় হিসেবে গ্রহণ করি। তদ্রুপ আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাঁর নৈকট্য লাভ করেছেন এমন কাউকে এরূপ মনে করতে কোন অসুবিধা নেই। আর মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিতদের জন্য দোয়া করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। নবী করীম (দঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোমাদের আমলসমূহ তোমাদের মৃত আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে পেশ করা হয়। তোমাদের আমল সমূহ যদি ভাল হয় তা দ্বারা তারা আনন্দিত হন। আর যদি ওগুলোর মধ্যে এর ব্যতিক্রম পায় তখন তাদের জন্য কবরবাসী আত্মীয়-স্বজনরা মাগফেরাত কামনা করে। এবং এই মর্মে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করে হে আল্লাহ! তাদেরকে আমাদের মত হেদায়াত দান ব্যতীত মৃত্যু দিওনা।"

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শরহে সুদুর কিতাবে বর্ণনা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাঃ) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন "জীবিতদের আমল সমূহ মৃত ব্যক্তিদের সম্মুখে পেশ করা হয় যদি তারা তাতে ভাল কিছু দেখে তারা আনন্দিত হয় আর খারাপ কিছু দেখলে তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে, হে আল্লাহ! তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।"

হযরত আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তরিক্বতেরও ইমাম

● মাওলানা মুজিবুর রহমান নেজামী ●

হানাফী মজহাবের জনক, শরীয়তের মূলনীতিমালা প্রণেতা তবে তাবেয়ী, ইমামে আহলে সুন্নাহ, ফকীহগণের মাথার মুকুট, আলেমদের সম্মানের প্রতীক হযরত আবু হানিফা (রঃ) কেবলমাত্র শরীয়তের ইমাম ছিলেন না। তিনি ছিলেন তরিক্বতের শ্রেষ্ঠ রূপকার, ইমাম ও জনক। তিনি শরীয়ত ও তরিক্বতকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। শরীয়তের নির্যাস যে তরিক্বত তা তিনিই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ফিকহর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে তরিক্বতের মর্মবাণীই প্রতিফলিত হয়েছে। তরিক্বতের মর্ম কথা হচ্ছে, "নিজকে চেনার মাধ্যমে প্রভুর পরিচয় লাভ করা।" যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে নিজকে চিনল সে তার প্রভুকে চিনল। এই হাদিসের মূল কথা হচ্ছে নিজকে চেনা। ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহির ফিকহের সংজ্ঞাতেও একথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেন "আত্মার সুবিধা ও অসুবিধা, কোন জিনিস উপকারী ও কোন কোন জিনিস ক্ষতিকর তার ধারণা লাভ করাই হচ্ছে ফিকহ। তিনি এবাদত, মুজাহিদা, তরিক্বতের মূল নীতিতে বড় ধরনের সফলতা অর্জন করেছেন। প্রাথমিক জীবনে তিনি মানুষের ভীড় ত্যাগ করে একাকী জীবন যাপনের ইচ্ছা করেন। মানুষের প্রশংসা গ্রহণ করা থেকে নিজ আত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখেন। তিনি রাত-দিন আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র হাঁড় সমূহ একত্রিত করছেন। কিছুকে অপর কিছু থেকে বাছাই করছেন। উক্ত স্বপ্ন দেখে তিনি অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে পড়েন। তিনি হযরত মুহাম্মদ বিন সিরীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এক বন্ধুর কাছে উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা চান। তিনি উত্তর দেন যে, আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র জ্ঞান ও তাঁর সুন্নাতের সংরক্ষণে এমন উচ্চমানে আসীন হবেন যেন আপনি ঐ গুলোতে ক্ষমতা প্রয়োগ করতঃ শুদ্ধকে অশুদ্ধ থেকে পৃথক করবেন। সবলকে দূর্বল থেকে বাছাই করতে পারবেন। তিনি দ্বিতীয়বার রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখেন। তাঁকে বলা হয়, "হে হানিফা! তোমাকে আমার সুন্নাত জীবিত করার জন্য তৈরী করা হয়েছে তুমি নির্জনবাসের চিন্তাভাবনা অন্তর থেকে বের করে দাও।" তিনি অধিকাংশ পূর্ববর্তী মশায়েখদের শিক্ষক ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম আদহাম, ফুদাইল ইবনে আয়াজ, দাউদ তা'য়ী, হযরত বিশর হাফি প্রমুখ তাঁর থেকে ফয়জ লাভ করেন। আলেমদের মধ্যে এ ঘটনাটি প্রসিদ্ধ যে, তাঁর যুগে আবু জাফর আল মনসুর খলিফা ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে চারজন আলেমের একজন কে কাজী বানানো হবে। উক্ত চারজনের মধ্যে ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলাইহি'র নামও ছিল। অবশিষ্ট তিনজন হচ্ছেন হযরত সুফিয়ান সওরী, সেলাহ ইবনুস সিয়াম এবং শুরাইক রাহমাহুমুল্লাহু তা'আলা। এ চারজন বিদগ্ধ আলেম ছিলেন। মনসুর দূত পাঠিয়ে বলেন, উক্ত চারজন মনীষীকে দরবারে নিয়ে এসো। অতঃপর এ চারজন একত্রিত হয়ে যখন যাত্রা করেন রাস্তার মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য এক একটি পন্থা আবিষ্কার করেছি। সকলই বলেন আপনি যা আবিষ্কার করবেন যথার্থই করবেন। তিনি বলেন, আমি যে কোন কৌশলে উক্ত কাজীর পদটি নিজ থেকে দূরে রাখব। সেলাহ ইবনুস সিয়াম নিজকে মাতাল করে নেবেন, সুফিয়ান সওরী পালিয়ে যাবেন এবং শুরাইক কাজী হয়ে যাবেন। সুতরাং সুফিয়ান সওরী উক্ত সমাধানটি পছন্দ করেন এবং রাস্তার মধ্যেই পালিয়ে যান। একটি নৌকায় আরোহণ করে বলেন, আমাকে আশ্রয় দাও। মানুষেরা আমার মাথা কর্তন করতে চাচ্ছে। এ কথা বলে তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র এই বাণীর দিকে ইঙ্গিত করেন, 'যাকে কাজী বানানো হয় তাকে ছুরি বিহীন যবেহ করা হলো।" নাবিক তাঁকে নৌকার ভেতর লুকিয়ে রাখে। অবশিষ্ট তিন জনকে মনসুরের সম্মুখীন করা হয়। মনসুর ইমাম আযমকে বলেন, আপনি কাজী পদের জন্য খুবই উপযুক্ত। ইমাম আযম বলেন, হে খলিফা! আমি আরব নই, তাই আরব নেতারা আমি বিচারক হলে খুশি হবেন না। মনসুর বলেন, প্রথমতঃ এ পদটি সম্পর্ক ও বংশের সাথে সম্পৃক্ত নয় এটি জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সাথে সম্পৃক্ত। যেহেতু আপনি যুগের সব জ্ঞানীর শীর্ষে তাই আপনিই উক্ত পদের জন্য উপযুক্ত ও যোগ্য। ইমাম আযম বলেন, "আমি উক্ত পদের উপযুক্ত নই। অতঃপর বলেন, 'আমি উক্ত পদের যোগ্য নই' যদি সত্যি হয় তা হলে আমি উক্ত পদের যোগ্য নই। যদি মিথ্যা হয় তা'হলে মিথ্যুককে মুসলমানদের কাজী বানানো উচিৎ নয়। যেহেতু আপনি মখলুকের শাসন কর্তা সেহেতু আপনার জন্য একজন মিথ্যুককে নিজের প্রতিনিধি বানানো, মানুষের সম্পদের বিশ্বস্ত ঠিকানা বানানো, মুসলমানদের ইজ্জত আবরুর রক্ষক বানানো সঙ্গত নয়।" এ কৌশল অবলম্বনে তিনি কাজীর পদ থেকে মুক্তি পেলেন। এরপর মনসুর সেলাহ ইবনুস সিয়ামকে আহ্বান করেন। তিনি খলিফার হাত ধরে বলেন, "হে মনসুর বলুন, এ তো মাতাল, একে বের করে দাও।" অতঃপর হযরত শুরাইক'র

পালা আসে। তাকে বলেন, আপনার কাজীর পদ পাওয়া উচিৎ। তিনি বলেন, "আমি বিকৃত স্বভাবের মানুষ, আমার মস্তিষ্কও ক্ষীণ।" মনসুর উত্তর দেন, "সুস্থ মস্তিষ্কের জন্য শরবৎ ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয় যাতে মস্তিষ্কের দুর্বলতা দুর হয়ে যায় ও পূর্ণ বিবেক অর্জিত হয়।" মোটকথা কাজীর পদটি হযরত শুরাইককে প্রদান করা হয়। ইমাম আযম তাঁকে ত্যাগ করেন অতঃপর আর কখনো কথা বলেন নি। এ ঘটনা থেকে তাঁর পূর্ণতা দু'দিক থেকে প্রকাশ পেয়েছে। এক. তাঁর দুরদর্শিতা এত উন্নত ছিলো তিনি প্রথমেই সকলের বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাস নিরীক্ষণ করতঃ সঠিকভাবে অনুমান করতে পারতেন। দুই. নিরাপদ পথে অবস্থান করে নিজকে মখলুক থেকে বাঁচিয়ে রাখা যাতে সৃষ্টির মধ্যে নেতৃত্ব ও সম্মানের দ্বারা গর্ব তৈরী না হয়। এ ঘটনাটি ঐ বিষয়ের প্রামাণ্য দলিল যে, নিজের সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্য একাগ্রতা অবলম্বন উত্তম। অথচ বর্তমানে মানুষ মান সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে রিপুর তাড়নায় সত্য পথ থেকে অনেক দুরে চলে গেছে। মানুষেরা রাজা বাদশাহদের দরবারকে নিজেদের কেবলা মনে করে। জালেমদের কুটিরকে বায়তুল মা'মুর মনে করছে, অত্যাচারীদের মসনদকে কাবা কাওসাইন আও আদনার'র সমান মনে করছে।

সৈয়িদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলছেন, যখন হযরত নাওফল বিন হাব্বান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ইন্তিকাল হয় তখন আমি স্বপ্নে দেখি যে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, সমস্তলোক হিসাব নিকাশের স্থানে দণ্ডায়মান। আমি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হাউজে কাওসারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখতে পাই। তাঁর ডানে বামে অনেক বুজুর্গ বিদ্যমান। আমি দেখি একজন বুজুর্গ যাঁর চেহারা জ্যোতির্ময়, চুল সাদা হুজুরের বরকতময় চেহারার উপর নিজ চেহারা রেখেছেন। তাঁর সামনে হযরত নাওফল বিদ্যমান। যখন হযরত নাওফল আমাকে দেখেন তিনি আমার কাছে চলে আসেন এবং সালাম করেন। আমি তাঁকে বলি আমাকে পানি দান করুন। তিনি বলেন আমি হুজুর থেকে অনুমতি নিয়ে নিই। অতঃপর হুজুর অঙ্গুলি মোবারক দ্বারা অনুমতি দান করেন এবং তিনি আমাকে পানি দান করেন। তা থেকে কিছু পানি আমি পান করি, কিছু পানি নিজ বন্ধুদের পান করাই। তবে উক্ত পাত্রের পানি যে রূপ ছিলো ঐ রূপই রয়ে গেল, কম হয় নি। অতঃপর আমি হযরত নাওফলকে জিজ্ঞাসা করি, হুজুরের ডান দিকে বুজুর্গ ব্যক্তির পরিচয় কী? তিনি বললেন, ইনি হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম এবং হুজুরের বাম পার্শ্বে হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। এভাবে আমি অবগত হচ্ছিলাম একে একে আমি সতের জন বুজুর্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। যখন আমার চোখ খুলে গেল তখন দেখি হাতের আঙ্গুলসমূহ সতের সংখ্যায় পৌঁছেছে।

হযরত য়াহয়া বিন মুয়াজ রাজি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখি আমি আরজ করি হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কেয়ামত দিবসে কোথায় অন্বেষণ করব? তিনি বলেন, আবু হানিফার জ্ঞানের কাছে অথবা তাঁর পতাকার নিকট। হযরত দাতা গঞ্জ বখশ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলছেন, আমি সিরিয়ায় মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল হাবশী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র রওজা মোবারকের মাথার দিকে শয়ন করেছিলাম। স্বপ্নে দেখি যে আমি মক্কা মোকাররমায়। হুজুর আলাইহিস সালাম জনৈক বুজুর্গকে কোলে ছোট সন্তানের মত নিয়ে বাবে শাইবা দিয়ে প্রবেশ করছেন। আমি প্রেমের আতিশয্যে দৌড়ে গিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র চরণে চুম্বন করি। আমি এই বিষয়ে হত চকিত ও আশ্চর্যান্বিত ছিলাম যে, এ বুজুর্গ কে? হুজুরের আমার অন্তরের কথা জানা হয়ে যায়। হুজুর বলেন, ইনি তোমার ইমাম তোমারই অভিভাবক। অর্থাৎ আবু হানিফা রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি। এ স্বপ্ন থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাঁর ইজতিহাদ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র অনুসরণে নির্ভুল কেননা তিনি হুজুরের পিছনে স্বয়ং যাচ্ছিলেন না বরং হুজুর স্বয়ং তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হুজুর থেকে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। যে ব্যক্তি হুজুরের সঙ্গে বিদ্যমান তার থেকেও ভুলের সম্ভাবনা নেই। এটি একটি সুক্ষ্ম ইঙ্গিত।

হযরত দাউদ তায়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি তখন জ্ঞানার্জন থেকে অবসর নেন। তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, যুগের অদ্বিতীয় আলেম রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তখন তিনি হযরত ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলইহির খেদমতে ফয়েজ অর্জনের জন্য উপস্থিত হন। আরজ করেন, এখন কী করব? ইমাম আযম বলেন, عليك بالعمل فان العلم بلا عمل كا لجسد بلا روح এখন তোমাকে তোমার জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা উচিৎ। কেননা আমল বিহীন জ্ঞান হচ্ছে রূহ বিহীন দেহের মত। আলেম যতক্ষণ আমল করবেনা তার আত্মার বিশুদ্ধতা ও একনিষ্ঠতা অর্জিত হয়না। যে ব্যক্তি কেবল মাত্র জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সে জ্ঞানী নয়। আলেমের জন্য আবশ্যক হচ্ছে সে কেবলমাত্র জ্ঞানের উপর তুষ্ট থাকবেনা। কেননা মূল জ্ঞানের চাহিদাই হচ্ছে আমলকারী হওয়া যে ভাবে হেদায়তের চাহিদাই হচ্ছে মুজাহিদ হওয়া। যেভাবে মুশাহাদা মুজাহিদ ব্যতীত হয়না। অনুরূপ আমল ব্যতীত জ্ঞান ফলপ্রসু নয়।

তথ্য সূত্রঃ কাশফুল মাহজুব
কৃতঃ হযরত দাতা গঞ্জ বখশ লাহুরী।

বিস্ময়কর সূফি প্রতিভা মোল্লা আব্দুর রহমান যামী (রাহ্)

● অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ●

মোল্লা আব্দুর রহমান যামী (রাহ্) ২৩ সাবান ৮১৭ হিঃ ৭ নভেম্বর ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইরানের ছোট্ট শহর যামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান 'যাম' এর নামানুসারে তিনি 'যামী' নামে অধিক পরিচিত। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলিম এবং খ্যাতিমান বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি পিতার নিকট হতে আরবী, ফার্সী, কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, উসুল, ইল্‌মে কালাম ও আরবী ব্যাকরণের মত কঠিন বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। শৈশব হতেই তিনি প্রখর মেধাবী ও অতি বিচক্ষণ ছিলেন। যে কোন বিষয় তিনি একবার পড়লে বা কানে শুনলেই তা তৎক্ষণাৎ মুখস্থ করে নিতে পারতেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে মোল্লা যুনাইদ (রাহ্) ও খাজা আলী সমরকন্দী (রাহ্) এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হযরত খাজা আলী (রাহ্) এর নিকট হতে চল্লিশটি ছবক গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর কাছে অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। একইভাবে তিনি হযরত কাযী রুম (রাহ্) এর মত মহৎ ব্যক্তির নিকট হতে জ্ঞানার্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর মাত্র কয়েকটি বক্তৃতা শুনে তিনি প্রচুর জ্ঞানলাভে ধন্য হন। বস্তুতঃ তিনি ইতিহাস, দর্শন, সূফিতত্ত্ব, কাব্য চর্চা, ছন্দ ও অলংকার শাস্ত্র ও মরমী সঙ্গীতের উপর উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।। হযরত কাযী রুম মোল্লা যামীর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন "এ শহরের গোড়া পত্তনের পর হতে যামীর মত এত বড় বিদ্বান ব্যক্তি আসমা নদীর একূল ওকূল তথা সমরকন্দে জন্ম গ্রহণ করেননি।"

সূফিবাদের প্রতি আগ্রহ :

শৈশব হতেই হযরত আব্দুর রহমান যামী (রাহ্) তাঁর পিতার সূফিদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। যখনই তিনি সময় পেতেন অলী দরবেশদের সাথে সময় কাটাতেন এবং তাঁদের সঙ্গ লাভে ধন্য হতেন। সূফিতত্ত্ব বিষয়ে তাঁকে যিনি খুব বেশী অনুপ্রাণিত করেন তিনি হলেন হযরত সৈয়দ আল্- দীন (রাহ্)। হযরত সৈয়দ আল-দীন একজন প্রসিদ্ধ সূফি সাধক ও ইন্‌সানে কামিল ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে এসেই মোল্লা যামী দুনিয়ার মোহ মায়া ত্যাগ করে অতি সাধারণ জীবন যাপন করতে শুরু করেন। তাইমুর এবং তার উত্তরসূরীদের শাসনামলে যে কয়'জন কবি, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব হয় তাদের মধ্যে হযরত মোল্লা যামীর নাম উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জ্ঞানচর্চায় মোল্লা যামীর অবদান অবিস্মরণীয়। ঐ সময়ে দৌলত শাহ্ রচিত বিশ্বকোষ "মাযালিমুল ওশ্‌শাক"-এ একশত পঞ্চাশজন কবি ও লেখকের নাম উল্লেখ রয়েছে। এ গ্রন্থে তাইমুর এর শাসনামলের যে সকল লেখকের নাম উল্লেখ ছিল তাদের নাম মির্জা আবু সাঈদ এর শাসনামল অর্থাৎ ১৫ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল আর তাঁরা হলেন : বুরান্দক, আবু ইসহাক, সায়্যিদ ক্বাসিম আনোয়ার আওহাদ সাবযুয়ারী, ইবাদ নিসাপুরী, সাইয়্যিদ নিয়ামত উল্লাহ্, কাতিবী, আবাকী আমীর শাহ্ কুর্দী, আব্দুর রহমান যামী প্রমুখ প্রতীতযশা কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ। উল্লিখিত কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে মোল্লা যামীই একমাত্র কবি যার অবস্থান অন্যান্য সমসাময়িকদের উর্ধ্বে। মোল্লা যামীর কাব্য ছিল চিরন্তন আবেদন সমৃদ্ধ এক বিশ্বজনীন সাহিত্য। তাঁর কাব্যতত্ত্বে সুফতাত্ত্বিক অধিবিদ্যা এবং দর্শনের অবিমিশ্র প্রতিফলন লক্ষণীয়।

কাব্য রচনা :

ফার্সী ভাষায় অনেক কবি সাহিত্যিক কাব্য রচনা করলেও বিশেষ করে সাতজন ফার্সী কবির নাম সর্বকালের সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তাঁরা হলেন কবি ফেরদৌসী, আনোয়ারী, জালাল উদ্দীন রুমী, শেখ সাদী, হাফিজ ও যামী। কিন্তু উল্লিখিত সাতজনের মধ্যে যামীর নাম সবার উপরে স্থান পেয়েছে। যামীর কবিতায় শেখ সাদীর নৈতিকতা বোধ, হাফিজের সরলতা ও কবি নিযামীর আবেগময়তার সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর পুরোটা জীবন ছিল সাহিত্য চর্চার জন্য নিবেদিত। তাঁর কবিতা গল্প ও প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। তোহ্ফায়ে শামী'তে তার ছেচল্লিশটি সাহিত্য কর্ম স্থান পেয়েছে। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা, অলি দরবেশের জীবনী, সূফিতত্ত্ব, আরবী ব্যাকরণ, আরবী ছন্দ ও অলংকার শাস্ত্র, কাব্য ও মরমী দর্শন চর্চা করে অধিক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর লিখনির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তিন খন্ডের 'দিওয়ান' সাত খন্ডের 'মসনবী' 'বাহারিস্তান' "হাফ্ত",

"নফহাতুল উনুস" "ইউসুফ জুলাইখা", "শাওয়াহেদুন নবুয়্যত", 'আশিয়াতুল লাজাত", "লাওয়াইহ" ইত্যাদি। তিনি সূফিতত্ত্বের উপরও অনেক বই লিখেছেন। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বইয়ের নাম হল "লাওয়ামী" বা আলোকচ্ছটা। এ কিতাবে তিনি সূফি দার্শনিক শায়খুল আকবর মুহিউদ্দিন ইব্নুল আরবীর 'ফুছুছুল হেকাম' এর বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। সম্ভবতঃ এটাই ছিল যামীর শেষ সাহিত্য কর্ম। তাঁর যৌবনে লিখিত বইয়ের নাম 'নাখদুম ইয়াজুজ'। তিনি সূরা ফাতিহার উপর টিকাও লিখেছেন, তাঁর রচিত "রিসালাত-ই-তাহিলিয়া" বা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রবন্ধে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কিত দার্শনিক মতবাদ বর্ণিত হয়েছে। তিনি প্রসিদ্ধ সূফিদের জীবনী ও তাঁদের মতবাদ ও চিন্তাধারা নিয়ে বিশদ আলোচনা করতেন। তাঁর 'নয়া নামায়' মাওলানা রুমীর মসনবী কিতাবের প্রথম অধ্যায়ের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তিনি "মিফতাহুল গায়েব" এবং আরবী ব্যাকরণ "ক্বাফিয়ার" বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত পাদটিকা লিখেছেন। এটি শরহে যামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

শেখ সাদীর 'গুলিস্তা'র পরে তাঁর লেখনী 'বাহারিস্তা' পুস্তকে আটটি রাওয়া বা অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি রাওয়াতে রয়েছে ন্যায় বিচার, বদান্যতা, প্রেম, সুখকর গল্প, সূফি সাধকদের দুরদর্শিতা সম্পর্কিত অতি চমৎকার উপাখ্যান। সূফি দার্শনিক রাজা বাদশাহ, কবি-সাহিত্যিক এমনকি জীব জন্তুকে নিয়ে মজাদার গল্প এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। যামীর "লাওয়াইক" সূফিবাদ তথা মরমীবাদের একটি গ্রহণযোগ্য কিতাব। এ কিতাব সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন, "সত্যানুসন্ধানকারী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের আল্লাহকে পাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের অনুভূতি সম্পর্কে এই কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে।" এ গ্রন্থে কবি মানবের অন্তরাত্মার যাহেরী এবং বাতেনী ইল্‌মের এবং পার্থিব অর্জনের জন্য অহংকার সম্পর্কিত বিষয়ের উপরও আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব। যদি মহান প্রভুর সাথে মানুষের আত্মার যোগাযোগ স্থাপন না হয় তাহলে মানবের অন্তরে ঐশী আলোর অনুপ্রবেশ ঘটে না। মানুষ তার মনে আধ্যাত্মিক জাগরণ সৃষ্টি করতে পারলেই 'ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ' স্তরে উপনীত হতে পারে। পার্থিব সুখ শান্তি, আরাম-আয়েশ, যশ-খ্যাতি ও ক্ষমতা খুবই ক্ষণস্থায়ী, এই দুনিয়া আমাদেরকে এ সবের মায়াজালে ফেলে আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। যামী বলেন, "পার্থিব আরাম-আয়েশ মানুষকে গ্রাস করে ফেলেছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশে এ সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কায়-মনোবাক্যে নিজেকে সেই মহান আল্লাহর কাছে সোপর্দ করুন যে আল্লাহ্ কখনো নি:শেষ হবেননা। তিনিই সব সময় বিরাজমান।"

যামীর তিনটি 'দিওয়ান' (গজল) এ সাতটি মসনবী কবিতা রয়েছে। প্রথম দিওয়ান "ফাতিহাতুস সাহার" বা যৌবনের জাগরণ ১৪৭৯ খ্রী: রচিত হয়। যামী "ওয়াসীয়াতুল ইখ্‌দ" এবং "খাতিয়াতুল হায়্যাত" রচনা করেন ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর রচিত সাতটি গল্প উপাখ্যান নিম্নরূপ:

১। সিলসিলাতুয্ যাহাব
২। সালমান ওয়া আবসাল
৩। তোহফাতুল আহ্‌রার
৪। সুবহাতুল আহ্‌রার।
৫। ইউসুফ জুলাইখা
৬। লাইলী মজনু
৭। ঝিরাত নামা-ই-ইসকান্দারী।

যামীর গজল রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে শব্দ চয়ন,অলংকরন ও উপস্থাপনায় সাদী ও হাফিজের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচিত "নয়ানামায়" তিনি জালাল উদ্দিন রুমীর বাচন ও রচনাশৈলী অনুসরণ করেছেন। তাঁর গজলগুলো দার্শনিক ও মরমী চেতনা সমৃদ্ধ। যামী অতিমাত্রায় ধার্মিক এবং একজন প্রকৃত সূফি ছিলেন।

যামীর 'ইউসুফ জুলাইখা" "দিওয়ান" এবং "ইসকান্দর নামা" বাংলায় অনুদিত হয়েছে। আলাওল হতে শুরু করে পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকগণ যামীর অমূল্য সাহিত্য কর্ম-বাংলায় অনুবাদ করে আমাদের সাহিত্য অঙ্গণকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন।

যামী বৃদ্ধ বয়সে হজ্বব্রত পালন করেন, হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে যাত্রা পথে তিনি বাগদাদ, খোবাসান, আলেপ্পো, তাবরীজ সহ অনেক শহরে যাত্রা বিরতি করেন। যাত্রাবিরতিকালে তাঁকে এ সব এলাকার সর্বস্তরের লোকজন সানন্দে গ্রহণ করেন এবং আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। তিনি ৭৮ বছর বয়সে ৮৯৪ হিঃ সনের ১৮ মুহররম (১৪৯২ খ্রী:) ইন্তিকাল করেন। তাঁর যানাযায় অনেক রাজা-বাদশা, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ-সহ লক্ষলক্ষ মানুষ শরীক হন।

আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়

● অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী ●

বেলায়াত, সূফীতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত ইতিহাস ভিত্তিক গ্রন্থ "ছিয়ারুল আউলিয়া" যা ১৩০২ ইংরেজী সন থেকে ১৩২০ ইংরেজী সন পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিরচিত। কিতাবটি রচনার সূত্রপাত করেন–শায়খুশ শুয়ুখিল আলম, সুলতানুল মশায়েখ, মাহবুবে ইলাহী, হযরত খাজা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া কুদ্দাসা সিররাহুল আজিজ। পরবর্তীতে তার পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করেন তাঁরই মুরিদ পরিবারের সদস্য বিখ্যাত আধ্যাত্মিক মণীষী হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ মুবারক মুহাম্মদ উলুব্বী আল কিরমানী (রহঃ) যিনি "আমীরে খুরদ" নামে সমধিক পরিচিত। মূল ফার্সী ভাষায় রচিত এ অমূল্য গ্রন্থখানা অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মাহবুবে ইলাহী খাজা নিজাম উদ্দীন (কঃ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ ও বিবৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া চিশতিয়া পরিবারের অপরাপর মণীষীদের সম্পর্কে তথ্যাদিও সন্নিবেশিত হয়েছে। ৫৫০ পৃষ্ঠা কলেবরের উক্ত গ্রন্থ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ বাংলা ভাষান্তর ও ভাব সম্প্রসারণ করতঃ আমরা উপর্যুক্ত শিরোনামে পর্বে পর্বে প্রকাশের প্রয়াস নিয়েছি।

মারিফাত তত্ত্ব সম্পন্ন অল্প বাণীতে সেমার অজুদ প্রসঙ্গেঃ গ্রন্থকার বলেন, আমি আমার মাননীয় পিতার নিকট শুনেছি যে, একদা তার ভাই সৈয়দ হোসাইন এর মাটির দেয়ালের ঘরে সেমা মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আর সেখানে হযরত সুলতানুল মশায়েখও তশরীফ রাখছিলেন। এক কাওয়াল-গায়ক হযরত মাওলানা অজিহ উদ্দীন এর রচিত মনকাড়া প্রাণদোলা কাওয়ালীর একটি মাত্র কলি খুবই মধুর সুরে, আন্তরিকতার সাথে ধীরে ধীরে পরিবেশন করা আরম্ভ করতেই তার আছর বা প্রভাব হযরত সুলতানুল মশায়েখের উপর গভীরভাবে পতিত হলো। শে'র বা সংগীত কলিটি ছিলঃ

سینا بن ہیاہی ایسا سگے سین پاسوں

এটি পাঠ করার সাথে সাথে বাবা খাজা নিজাম উদ্দীন সুলতানুল মশায়েখ রকস বা নৃত্য করতে লাগলেন, তার কোন এক প্রিয় পাত্র তাঁকে সঙ্গ দিলেন অর্থাৎ সেমাতে ও নৃত্যে অংশ নিলেন। এ সময় আহাজারী করে ক্রন্দন করার হালত তার উপর এমন গালেব বা জয়ী হয়ে গেল তাতে এক মহারোল পড়ে গেল। এক ঘন্টা পর যখন সেমা সমাপ্ত হলো তখনও হযরত সুলতানুল মশায়েখের উপর উক্ত হালত বিরাজ করছিল। যখন কাওয়ালগণ এ অবস্থা দেখলেন তখন পুনরায় সেমা করা আরম্ভ করলেন এবং পুনরায় ঐ কালাম গাহিতে লাগলেন।

এরই মধ্যে হযরত সুলতানুল মশায়েখ আপন আঙ্গুল মোবারক দ্বারা তাঁর হাটু মোবারকের উপর এমন ভাবে লিখতে লাগলেন যেমন কলম দ্বারা কাগজের উপর লিখা হয়ে থাকে। ঐ সময় আমার (গ্রন্থকারের) শ্রদ্ধাভাজন পিতা, গ্রন্থকারের ভগ্নিপতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বর্গের নেতা সৈয়দ কামাল উদ্দীন আহমদ, ইকবাল খাদেম এবং মলকুল শুয়োরা বা কবিদের অগ্রনায়ক আমির খসরু হযরত সুলতানুল মশায়েখ বাবা খাজা নিজাম উদ্দীন মাহবুবে ইলাহীর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন।

দণ্ডায়মান মনীষীদের মধ্য হতে সৈয়দ কামাল উদ্দীন আহমদ মহাত্মা বাবা নিজামের ইশারা ইঙ্গিত বুঝে গেলেন। আর ইকবাল খাদেমের উদ্দেশ্যে বললেন, যে বাবাজান কাগজ-কলম ও দোয়াত একবারে একই সাথে নিয়ে এসে বাবাজানের হাত মুবারকে অর্পণ করলেন। এমতাবস্থায় বাবা নিজাম বাবা শেখ ফরিদ এর প্রতিবেশী খাজা মাহমুদকে রকস বা নৃত্য করার জন্য ইঙ্গিত করলেন, খাজা মাহমুদ নাচতে লাগলেন, এরি মধ্যে তিনি কাগজ উপরের দিকে উঠালেন। কিন্তু কার এমন সাহস আছে যে তাঁর হাত মুবারক থেকে নিতে পারে? এতদুদ্দেশ্যে ইকবালই সামনে অগ্রসর হলেন এবং খাজা নিজাম এর হাত মুবারক থেকে কাগজটি নিয়ে নিলেন। অনেক লোকজন ঐ কাগজে কী লিখা আছে তা দেখতে আগ্রহ করলেন, কিন্তু ইকবাল খাদেম ছিলেন রহস্যজ্ঞাত ব্যক্তি। অনতিবিলম্বে তিনি ঐ কাগজটি মুখে নিয়ে গিলে ফেললেন আর কাউকে ঐ রহস্য জাত লিখা সম্পর্কে জানতে দিলেন না।

মুষ্টিমেয় কেউ উক্ত কাগজের লিপিটি সম্পর্কে খাজা ইকবাল হতে বড়ই অনুনয় সহকারে জেনে নিয়েছিলেন। ঐ ধরণের বর্ণনা থেকে কথিত আছে যে, উক্ত কাগজে ঐ ছন্দাংশটি লিখা ছিল যে, از دست تو بسندی بلست تو دیہم

এতদসত্ত্বেও যেহেতু আমার (গ্রন্থকার) নানাজান মাওলানা সামছুদ্দীন দামগানী হযরত সুলতানুল মশায়েখের ইয়ারে গার বা গুহার সহচর ছিলেন, এ কারণে কেউ কেউ উনার নিকট আরজ করেছিলেন যে এ মুশকিল বা সমস্যাটা আপনারই করুনায় সমাধান হবে যে, ঐ দিন সেমা চলাকালে বাবা নিজামের হালত এবং কাগজের অবস্থা কী রূপ ছিল তা আপনিই অনুগ্রহ পূর্বক খাজা নিজাম সুলতানুল মশায়েখ এর নিকট একটু জিজ্ঞাসা করে নেবেন। যখন মাওলানা সামছুদ্দীন সাহেব বাবা নিজামের নিকট প্রশ্ন করলেন ঐদিনকার ঘটনার

বিবরণ সম্পর্কে তখন বাবা নিজাম অশ্রুসিক্ত নয়নে আহাজারী করতঃ উত্তর দিলেন যে, ওহে মাওলানা ঐ কাগজে এ কবিতা কলিটিই লিপি ছিল যে,

نامہ نوشتن چہ سود چوں نرود سوئے دوست

সেমাকালে দান করাঃ একদা হযরত সুলতানুল মশায়েখ বাবা নিজাম উদ্দীন (কঃ) আপন পুরাতন হুজরা শরীফে বসা ছিলেন, ঐ হুজরা শরীফ যেটি খুঁটি দ্বারা নির্মিত বারান্দার মধ্যে অবস্থিত ছিল। খাজা নিজাম বাবার ঐ স্থানে একাকি বসা অবস্থায় সামেত নামক কাওয়াল সেমা করা আরম্ভ করলেন। ঐ সময় সুলতানুল মশায়েখ সম্প্রসারিত জগতে বিরাজ করছিলেন, তিনি সংসার বিমুখতা প্রদর্শন করলেন। অর্থাৎ যা কিছু ঘরের মধ্যে ছিল সবকিছু আল্লাহর বান্দাদেরকে দান করে দিলেন। সর্বশেষে আসলেন গ্রন্থকারের পিতা। ঐ সময় বাবা নিজামের সংসার বৈরাগ্য চরম আকার ধারণ করল। তিনি এদিক সেদিক দেখলেন। একটি দস্তরখানার উপর দৃষ্টি পড়ল। তাতে অত্র গ্রন্থকারের পিতাকে বাবা নিজাম বললেন যে, বাবুর্চিখানা থেকে কিছু রুটি নিয়ে নাও। রুটি আনা হলে বাবা নিজাম বললেন, ঐ রুটি গুলি দস্তরখানায় রেখে দাও। আর দস্তরখানা সহ রুটি গুলো তুমি নিয়ে যাও। প্রকৃতপক্ষে কোন আউলিয়াল্লাহ অথবা কোন আশেক খোদা প্রেমিক যখন সানুগ্রহে কোন নেয়ামত কোন দরবেশ ব্যক্তিকে দিয়ে দেন তখন ঐ নেয়ামত তার বংশের মধ্যে বংশানুক্রমে অব্যাহত ভাবে বজায় থাকে।

কাওয়ালদের উপর গাইবীভাবে ইলকা হয়ে থাকেঃ মুহাম্মদ মুবারক উলুবী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে যখন বাদশাহ কবর বেগ হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (কঃ) এর হাতে বয়াত হয়ে মুরীদ হলেন তখন তিনি চুল কাটালেন।

কিছুদিন পর বাদশাহর মাথা মুন্ডন করার সাধ হলো। অতঃপর তিনি তাঁর এ উদ্দেশ্য পূরণার্থে একটি অতি আশ্চর্য ধরণের মজলিস কায়েম করলেন, এ নিয়ত করলেন যে, ঐ মজলিসে সুলতানুল মশায়েখ তশরীফ আনবেন এবং আমাকে মাথা কামানোর ব্যবস্থা করবেন। এ উদ্দেশ্য নিয়ে সুলতানুল মাশায়েখ এর খেদমতে বাদশাহ নিজে এসে আরজ করলেন যে যদি এ মহা মনীষী কৃপা পরবশ হয়ে আপন চরণধূলি আমার গরীবালয়ে ফেলেন, তাহলে অধমের জন্য বান্দাহ নওয়াজী বা ভৃত্যের জন্য পরিপোষণ জনিত অনুগ্রহ ও দয়া হবে।

কিন্তু সুলতানুল মশায়েখ ঐ দাওয়াতটি কবুল করেননি। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ যখন অনেক কাকুতি মিনতি অনুনয় বিনয় ও মান্নত করলেন তখন নাছোড় বান্দার দাওয়াতটি অপারগতায় কবুল করে নিলেন। কবর বেগ বাদশাহ শহরের সমস্ত মশায়েখ-পীর সাহেব এবং নেতৃস্থানীয় সকল ব্যক্তিকে উক্ত অনুষ্ঠানে দাওয়াত করলেন। যখন সুলতানুল মশায়েখ বাদশাহর ঘরে তশরীফ নিয়ে আসলেন তখন খাওয়া দাওয়া সেরে যাওয়ার পর সেমার মজলিস অনুষ্ঠিত হলো। কাওয়ালগণ সেমা আরম্ভ করলেন প্রত্যেক ধরণের কাওয়ালী পরিবেশন করা হলো। কিন্তু হাজেরানে মজলিস বা সেমা মাহফিলে উপস্থিত লোকজন কারো উপর সেমার কোন আছর বা প্রভাব সৃষ্টি হলোনা। এভাবে মজলিস বন্ধ ছিল অর্থাৎ মাহফিল অর্ধাবস্থায় ক্ষান্ত দিতে হলো। শেষ পর্যন্ত হাসান বাহদী কাওয়াল এ শে'র বা কালামটি পড়লেন,

در کبنہ درویشی درمحنت بخویشی-بگزار مرا من بر سوئے مکن آفسانہ

উক্ত শে'র বা সংগীত কলির আছর বা প্রভাব সুলতানুল মশায়েখ এর উপর পড়ল যদ্দরুন তার উপর হাল জজবা প্রবাহিত হয়ে গেল। কান্না আরম্ভ হয়ে গেল। আর তার আসক্তির প্রভাব উপস্থিত লোকজনের উপরও পড়ল। সুতরাং যা কিছু সুলতানুল মশায়েখের অন্তরের মধ্যে খেয়াল-ধারণা আসত তদনুযায়ী কাওয়ালগণ শে'র গাইতেন। আর হৃদয়ের এ মিল জনিত ইলকা বা খোদা প্রদত্ত ধারণাটা অদৃশ্য হতে আসত। অর্থাৎ বাবা নিজামের মনের আগ্রহটি কাওয়ালের অন্তরে সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ হতে ঢেলে দেয়া হতো।

সেমার কালাম শুনে ক্রন্দন ও অশ্রুজলে অবগাহনঃ গ্রন্থকার বলেন, আমার উত্তমরূপে এ ঘটনাটি স্মরণ আছে যে, সুলতান গিয়াস উদ্দীন বাদশাহর আমলে তাঁর জামাতখানা বা বৈঠকখানার ছাদের উপর এক সময় সেমা মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। বন্ধুবর্গ ও প্রিয় ভাজনেরা খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। আমীর খসরু দণ্ডায়মান ছিলেন আর অসুস্থতার কারণে সুলতানুল মশায়েখ খাটের বিছানার উপর বসা অবস্থায় ছিলেন। হাসান বাহদী কাওয়াল সেমা আরম্ভ করলেন, তাঁর সেমার মধ্যে এ শে'রটি পড়লেন,

سعدی تو کیستی کہ در آئی درین کند - چندان فتادہ اند کہ ماصید غریبم

হযরত সুলতানুল মশায়েখের উপর ঐ শে'রটির আছর বা প্রভাব পড়ল, তিনি কাঁদতে লাগলেন। খাজা ইকবাল খাদেম খাটের বিছানার মাথার দিকে দাঁড়ানো ছিলেন, আর একটি পাতলা কাপড় দ্বারা রুমাল তৈরী করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হযরত সুলতানুল মশায়েখকে দিতে ছিলেন আর সুলতানুল মশায়েখ চোখের জল মুছে রুমাল টুকরা অশ্রুজলে সিক্ত করে কওয়াল হাসান বাহদীর দিকে নিক্ষেপ করতে ছিলেন। শেখ সাদী এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

نامردان چشم رنجودان عشق - گرفرد ریزند بخون اید نخوئے

شاد باش اے مجلس روحانیاں - تاخورند این مئے کہ من مستم بوئے

এভাবে যখন ঘন্টা খানেক অতিবাহিত হয়ে গেল এবং ধীরে ধীরে সেমার গতি কমে গেল তখন আমীর খসরুর ছেলে আমীর হাজী গজল পড়া আরম্ভ করলেন, এক সময় তিনি এই শে'র টিতে পৌঁছলেন।

خسرو تو کیستی کہ درآئی درین شمار' کسی عشق تیغ برسرمردان زدہ است

উক্ত শে'রটি শ্রবণ করার সাথে সাথে সুলতানুল

মশায়েখের পুনরায় পূর্ববৎ অবস্থার সৃষ্টি হলো। অবশেষে উক্ত শে'র শ্রবন করত হযরত সুলতানুল মশায়েখ অশ্রুসজল নয়ন মুছে মুছে একটি বস্ত্র খন্ড বা রুমাল আমীর হাজীর দিকে নিক্ষেপ করছিলেন অপর আর একটি রুমাল হযরত আমীরে খসরু এর দিকে নিক্ষেপ করছিলেন।

হাসান কাওয়াল বাবা নিজামের এ অবস্থা দেখে শেখ সাদী এর তাজকিরাতুস সদর বা বক্ষ সম্পর্কিত বর্ণনা যুক্ত সংগীত গাওয়া আরম্ভ করলেন, এমতাবস্থায় সুলতানুল মশায়েখ রকস বা নর্তন করার জন্য শেখ ওয়ুখুল আলম অর্থাৎ বাবা শেখ ফরিদ এর প্রতিবেশী দর উদ্দীন ইসহাক এর পুত্র খাজা মুসার দিকে ইঙ্গিত করলেন। খাজা মুসা শিষ্টাচার ও আদব বজায় রেখে সেমার নর্তন করার জন্য দন্ডায়মান হলেন, একঘন্টা ওয়াজদ বা ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগীত সহকারে লম্ফ ঝম্ফ ও নর্তন কুর্দন করার পর আদব সহকারে বসে গেলেন।

হযরত সুলতানুল মশায়েখ ঐ সময়েও রীতিমত আহাজারি ও ক্রন্দন এবং সেমার স্বাদ গ্রহণে লিপ্ত ছিলেন। সুবহানাল্লাহ। ঐ সময়টা কতই না উত্তম ছিল। তাঁর এ আস্বাদন এর কথা আমি (গ্রন্থকার) মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভুলতে পারব না। আর এই জওক স্বাদ ও মজার আকাঙ্ক্ষা যা আমি হযরত সুলতানুল মশায়েখের নিকট দেখেছি তাতে আমি ইচ্ছে করছি যে, সুলতানুল মশায়েখের স্মরণে আমি প্রাণ উৎসর্গ করে দেব।

دل بزلف تونہم عشق ابد دریابم
جاں بیاد توہم زندگی از سریابم

শেখ মুজাদ্দেদুদ্দিন বাগদাদীর শাহাদত এর বর্ণনাঃ শেখ মুজাদ্দেদুদ্দীন বাগদাদীর শাহাদাতের ঘটনা সৃষ্টি জগতের নিকট জানা আছে। তিনি শেখ নজমুদ্দীন কুবরার মুরীদ ছিলেন এবং সেমার প্রতি তাঁর সীমাহীন আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। সুতরাং তিনি সেমা বিহীন থাকতে পারতেন না। তাঁর পরিপূর্ণ কবুলিয়ত হাসিল ছিল, অর্থাৎ তিনি আল্লাহ পাকের অশেষ মকবুল বান্দা ছিলেন। অতএব সমকালিন লোকজন, জ্ঞানী-গুণীরা তাঁর অনুগত এবং মুরীদ ছিলেন।

বাদশাহ খাওয়ারেজম শাহ শেখ মুজাদ্দেদুদ্দীন বাগদাদী'র সুখ্যাতি ও তাঁর উপর সৃষ্টি জগতের আনুগত্যের কারণে তাঁকে ভয় করতেন। অবশেষে শেখ নজমুদ্দীন কুবরা (রাঃ) তাকে অতিরিক্ত সেমা করা থেকে কয়েকবার বারণ করেছেন। অতঃপর একদিন তিনি সেমাতে লিপ্ত ছিলেন, তাঁর পীর-মুরশিদ তাঁকে ডাকার জন্য খাদেমকে পাঠালেন। যখন খাদেম আসলেন তখন দেখলেন যে, তিনি সেমার স্বাদ গ্রহণে লিপ্ত। তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁর মুরশিদ তাঁকে আহ্বান করছেন। তাতে তিনি পরওয়া করলেন না। যখন ফেরত গিয়ে খাদেম মুরশিদ কেবলাকে ঘটনা আরজ করলেন তখন তিনি পুনরায় উক্ত শেখ বাগদাদীর নিকট প্রেরণ করলেন, বললেন, যাও তাঁর হাত ধরে সেমা থেকে তাঁকে বিরত করে দাও। খাদেম এসে দেখলেন যে তিনি পূর্ববৎ সেমাতে ডুবে আছেন। আর এ ছন্দটি আওড়াতে লাগলেন, بار بالا آمدیم وباز بالا میرویم (বাজেবালা আমদেম ও বাজেবালা মীরবীম) খাদেম তাঁর হাত ধরে তাঁকে আধ্যাত্মিক নৃত্য করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি বিরত থাকলেন না। পুনরায় গিয়ে খাদেম মুরশিদের নিকট বৃত্তান্ত খুলে বললেন, তখন শেখ নজমুদ্দীন বললেন, যে কথাটা তিনি মজলিসের মধ্যে বলতে ছিলেন ঐ বাক্যটি তাঁর ভাগ্যে আল্লাহ পাক লিপিবদ্ধ করে তাঁর জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যখন শেখ মুজাদ্দেদুদ্দিন সেমা হতে অবসর হলেন তখন সম্বিৎ ফিরে পেলেন আর ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন যে যা কিছু তিনি করেছেন তা সঠিক করেন নি।

এ কথা বুঝতে পেরে তিনি জ্বলন্ত আগুনের কয়লা ভর্তি থালা মাথায় নিলেন এবং তা নিয়ে আপন পীরের খেদমতে উপস্থিত হলেন। আর কৃষকদের কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন, নজমুদ্দীন কুবরা বললেন, এ ধরণের কাজ করার কোন প্রয়োজন নেই, তোমার পঠিত ঐ ছন্দাংশটি তোমার প্রাপ্যতার মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ এটা তোমার হক্ব।

অবশেষে ঐ সময়কালে সুলতান খাওয়ারেজম শাহ যিনি অশেষ মর্যাদাবান বাদশাহ ছিলেন, যাঁর সেনাবহিনীর মধ্যে ছয় লক্ষ ঘোড় সওয়ার সৈন্য ছিল। আর সমগ্র তুর্কীস্থান, খোরাশান, ইরাক পর্যন্ত, ইস্পাহানের অঞ্চল এবং সিন্ধু সাগর পর্যন্ত হিন্দুস্থানের পুরা রাজ্য তাঁর অধিনস্থ ছিল। তাঁর আব্বা বাদায়ে খফচাক নামক বংশোদ্ভূত ছিলেন। সম্রাট খাওয়ারেজম দেশ শাসন ও কর্ম দক্ষতার মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন। সে কারণে তাঁকে খোদাওন্দে জাহান বা বিশ্ব কর্তা অভিধায় সকলে স্মরণ করত। উভয়ে হযরত শেখ নজমুদ্দীন কুবরার মুরীদ ছিলেন। উভয়ের ইচ্ছে হলো যে, তারা পবিত্র হজ্বব্রত পালনে যাবেন।

এ উদ্দেশ্য নিয়ে উভয়ে হযরত নজমুদ্দীন কুবরার খিদমতে আসলেন এবং আর্জি পেশ করলেন যে আমাদের ইচ্ছে হলো হজ্বে যাওয়া। এতে যদি আপনি দয়াপরবশ হয়ে করুণা করে আপনার কোন বন্ধুকে আমাদের সফর সঙ্গী করেন তাহলে তা আপনার বড়ই অবদান হবে আমাদের উপর। ঐ মহান সফরসঙ্গীর উছিলায় যাতে আমাদের হজ্বও কবুল হয়ে যায়। শেখ নজমুদ্দীন কুবরা অনেক ভেবে চিন্তে ফরমালেন যে, আচ্ছা ঠিক আছে। বরং তোমরা শেখ মুজাদ্দেদুদ্দিন কে সাথে করে নিয়ে যাও। যে কথা সে কাজ। তাঁরা তিনজন মিলে রওনা হলেন সমুদ্রতীরে পৌঁছে বিশেষ জাহাজে তারা আরোহণ করলেন। উল্লেখ্য যে, শেখ মুজাদ্দেদুদ্দিন তাঁর সমসাময়িক কালে সর্ব শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যমন্ডিত রূপবান ব্যক্তি ছিলেন।

ঘটনা ক্রমে বাদশার মায়ের দৃষ্টি ঐ মনকাড়া, কলজে পোড়া সৌন্দর্যের উপর পড়ল। তাতে তিনি দুর্বল হয়ে গেলেন। তাঁর রূপের বাহারের উপর প্রেম পাগল হয়ে গেলেন। হযরত শেখ সাদী তার কবিতায় এ ধরণের পাগল পারার বর্ণনা ছন্দাকারে এভাবে দিয়েছেন,

تراخذ ہر کہ بیند دوست دارد گناہے نیست بر سعدئے مسکین

শেখ মুজাদ্দেদুদ্দিন খোদার প্রেম ডুবে থাকার কারণে নিজের প্রতি নিজের ধ্যান ধারণাও ছিলনা। একথা কিভাবে হতে পারে যে, খাওয়ারেজম বাদশার মায়ের প্রতি তাঁর ধ্যান থাকবে? তবে যখন সম্রাট খাওয়ারেজম এ কথাটা জানতে পারলেন যে, তাঁর মা শেখ মুজাদ্দেদুদ্দিনের প্রেমে পড়ে গেছেন, তাঁর প্রেমানলে জ্বলছেন। তখন মান সম্মান ও দম্ভ বশতঃ এ ধরণের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করার নিমিত্তে বাদশাহ শেখ সাহেবকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। যেই ভাবা সেই কাজ, তাঁকে শহীদ করে দিলেন এবং তাঁর কর্তিত মস্তক মোবারকের সাথে একহাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) সহ একটি থালার মধ্যে রেখে শেখ নজমুদ্দীন কুবরার খেদমতে প্রেরণ করলেন এবং একথা বলে পাঠালেন যে, শেখ মুজাদ্দেদুদ্দিন শহীদ হয়েছেন। আর এ প্রবাহিত রক্তগুলি তাঁরই।

এ কথা শুনে শেখ নজমুদ্দীন কুবরা বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, আমাদের মুজাদ্দেদুদ্দিন এর হত্যাকারী রক্তপাতকারী হলো খাওয়ারেজম শাহ এবং তাঁর সমগ্র রাজত্ব। যখন তার পবিত্র মুখ থেকে এ অভিশাপ বের হয়ে গেল তখন তিনি আফসোস করে বললেন, হায়! যদি আমরা এ ধরণের বদদোয়া না দিতে পারতাম! এ কথা বলার কিছু দিনের মধ্যে কুখ্যাত চেঙ্গিস খান চীনের দিক থেকে নয় লক্ষ ঘোড় সওয়ার বা অশ্বারোহী সৈন্য দল ঘোড়া, উট ছাগল-ভেড়ার পাল সহকারে আসল এবং সমস্ত সালতানাত- সমস্ত রাজ্য তছনছ করে দিল। কয়েক হাজার আলেম-ওলামা, ওলী-আউলিয়া, ছোট-বড় অনেক মানুষকে হত্যা করে ধবংস করল। সম্রাট খাওয়ারেজম শাহ এবং তাঁর সমগ্র শুভাকাঙ্ক্ষী সাহায্য-সহায়তাকারী সবাইকে এমনভাবে হত্যা করল যাতে তাদের কোন অস্তিত্বই রইলনা এ পৃথিবীতে। অনুরূপ বর্ণনা ঐতিহাসিকভাবে "তবকাতে নাসেরী" নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

পরিশেষে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, শেখ নজমুদ্দীন কুবরার মতো ওলী আল্লাহর বদদোয়ার ফলে ঐ দিন খোদার কহর গজব নাজিল হয়েছিল। যখন চেঙ্গিস খান খাওয়ারেজম শহরে আসল, তখন সে উম্মুক্ত তরবারী হাতে সেনা দল সহকারে শেখ নজমুদ্দীন কুবরার খানকাহ শরীফের দিকে আসল। শেখ সাহেবকে মুসল্লার উপর কেবলা মুখী হয়ে বসা অবস্থায় দেখতে পেল। যখন তাঁর উপর তরবারীর ঘা লাগাল, তাঁকে হত্যা করতে চাইলে তখন সে সফলকাম হলো না। এতে সে অবাক হয়ে গেল। শেখ সাহেব বললেন, তুমি হতভম্ব হলে কী হবে এর রহস্য শোন। আমি চল্লিশজন মুরীদকে চল্লিশটি হুজরাতে বসিয়েছি। যাদেরকে চল্লিশ দিন যাবৎ বসিয়ে রাখতে হবে। সাঁইত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়েছে আর মাত্র তিনদিন বাকী। মোট চল্লিশদিন পূর্ণ হলে তারা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছে যাবে অর্থাৎ তারা বেলায়তের পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। যতক্ষণ চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়ে যাবেনা তুমি আমাদেরকে কোন কিছুই বলতে পারবেনা।

যখন তিনদিন পর চল্লিশ দিন সমাপ্ত হলো আর ঐ সাধক চল্লিশ জন মুরীদ কামালিয়াতের অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্তির মর্যাদার আসনে উন্নীত হয়ে গেলেন। তখন পুনরায় ঐ কাফের মলয়ুন বা অভিশপ্ত খোদাদ্রোহীগণ খোলা তরবারী হাতে আসল। প্রথমে শেখ সাহেবকে তার মুসল্লা বা জায়নামাজ বা সাজ্জাদার উপর উপবিষ্ট অবস্থায় শহীদ করে দিল। তারপর ঐ নুতন চল্লিশ ওলীকে শহীদ করল, তারপর তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গ সহচর তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে হত্যাপূর্বক শহীদ করল।

ঐ সময়ে নিশাপুর অঞ্চলে কাফেরদের হাতে বাবা শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার শহীদ হয়েছিলেন। কাফেরগণ যখন নিশাপুর আসল আর শেখ আত্তারের সহচরবৃন্দকে কতল বা হত্যা করা আরম্ভ করল তখন শেখ সাহেব চিৎকার দিয়ে উঠলেন বললেন, এটা কোন ধরনের জব্বারী ও কাহহারী। অর্থাৎ এটা কী ধরণের নিপীড়ন কোন ধরণের পরাক্রমশীলতা কী ধরণের ক্রোধের প্রদর্শনী। আর যখন তাঁকে শহীদ করা আরম্ভ করল তখন তিনি ফরমালেন, সুবহানাল্লাহ, এটা কী ধরণের লুতফ ও করম। অর্থাৎ এটা কোন ধরণের শিষ্টতা আর কোন ধরণের উদারতা? (৪৭৬ পৃঃ)

মোদ্দাকথা হলো, একজন বিখ্যাত ওলীর মুখ নিঃসৃত উক্তি সারা বিশ্বকে ধবংস করে দিতে পারে। আবার বিশ্বকে ধবংসের হাত থেকে রক্ষাও করতে পারে। তাই হাদীসে পাকে বলা হয়েছে, ইত্তাকু ফিরাছাতাল মুমিনে লে আল্লাহ ইয়ানজুরু বেনুরিল কুলবে। আল্লাহর ওলীগণের দূরবিক্ষণতা থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কেননা তাঁরা হৃদয়ের নুর দ্বারাই দর্শন করে থাকেন।

আমার বক্তব্য হলো, আল্লাহর ওলীদের মধ্যে এমন ক্ষমতাশালী ওলীও রয়েছেন যাঁদের আত্মাটা এত শক্তিশালী যে তাঁদের দোয়া-বদদোয়ার ফলে পৃথিবী ভাঙ্গাগড়ার ক্ষমতা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে তাই তাঁদের কাছে রয়েছে কুন ফায়াকুনের অপার ক্ষমতা যা আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে অশেষ করুনা বলে দান করেছেন।

وما علینا الا البلاغ

মুসলিম নেতৃত্ব-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

মূলঃ টিমেথি জে. জ্ঞানতি, পি.এইচ.ডি.
অনুবাদঃ মোঃ গোলাম রসুল

আমরা তিন ধরণের নেতৃত্বের আবির্ভাব দেখতে পাই। (১) যারা সংরক্ষক ও সংরক্ষনকারী এবং সমাজ ও নবুওতের রক্ষক (২) যারা আধ্যাত্মিকভাবে প্রকৃত নবুওতের আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সংরক্ষক (৩) যারা নবুওতের আবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান পূর্বক নবুওতের ধারার মাধ্যমে বিশ্ববাসীদেরকে আল্লাহর পথে ও মতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করেন।

খলিফা (চার খলিফা): ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহানবী (দঃ) এর বেছালের পর মোহাম্মদ (দঃ) এর উদ্দেশ্য ও লক্ষমাত্রাকেই উম্মতের জন্য একমাত্র চাবিকাঠি মনে করতেন এবং বংশ মর্যাদা, শ্রেণী-গোত্র বা লিঙ্গের উর্ধ্বে উঠে সামাজিক বিপ্লবের ধারক ছিলেন তাঁরা। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ মেনে চলা, কুরআন শিক্ষা করা ও আমল করাই ছিল তাঁদের কাজ। তখন মুসলিম সেনাদের মাধ্যমে মুসলিম সাম্রাজ্য ও সভ্যতা উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার লাভ করে এবং খলিফাগণ মুসলিম সাম্রাজ্য ও সভ্যতার রূপকার রূপে আবির্ভূত হন। সংরক্ষন, একত্রিকরণ ও নেতৃত্বের ধারণা রক্ষা করা এতে প্রভাব বিস্তার করত।

খলিফার প্রশ্নে অনেক বিষয় জানা যায় ইতিহাস থেকে, আবার অনেক জিনিস অজানাও রয়ে গেছে। প্রথমতঃ আমরা জানি যে খলিফাদের সময় নেতৃত্ব সমকালীন ছিল; তখন কল্পনাপ্রসূত প্রতীক হিসাবে একজাতিতে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন ছিল, নবুওতের পরবর্তীতে শ্রেণী বিভাজন, জাতিগত বিভক্তি এসবের উর্ধ্বে উঠে সকলকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন ছিল। ইসলামের পুণর্জাগরণ, বিশ্বায়নের ক্ষমতা ও প্রাধান্য প্রভৃতি নেতৃত্বের শক্তি বলে বিবেচিত হতো। খলিফাদের সমাজ সংস্কারক ও প্রথা রক্ষাকারী হিসাবে সামগ্রিক স্বপ্ন ছিল না। বরং তাঁদেরকে সংরক্ষণকারী, রক্ষক, একজাতিতে আবদ্ধ থাকা ও ধারাবাহিকভাবে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকতে দেখা যেত। আকস্মিক ধাক্কা ও আতংকের মধ্যদিয়ে ৬৩২ খৃষ্টাব্দে রাসূল (দঃ) এর বেছালের পর মদিনার মুসলমান (আনছার) ও পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী কিছু লোকের মধ্যে দ্বন্ধ দেখা দিয়ে আলোচনা ভেঙ্গে যায়, কারণ মক্কা থেকে আগত মুসলমান (মুজাহেদীন) বিশেষকরে শক্তিশালী কোরায়েশ গোত্রের মুসলমান এবং রাসূল (দঃ) এর অতি ঘনিষ্টদের বাধা প্রদানের চেষ্টা চলছিল। কিন্তু মধ্য রাতের দ্বন্ধ নিরসন পূর্বক মহানবীর (দঃ) ঘনিষ্ঠ সহচর হযরত আবু বকর (রাঃ) কে মুসলিম উম্মাহর নেতা নির্বাচন করা হয়। তাঁর অবস্থানকে "খলিফা" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যেমন ভাবে কুরআনে আদম (আঃ) কে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ পরবর্তীতে দাউদ (আঃ) অন্যান্য নবীগণ ও মানুষকেও আল্লাহর প্রতিনিধি বিবেচনা করা হয়। এখানে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট আছে বলে মনে করা হয়। মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "তিনি ফিরিস্তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, এবং তাঁরা (ফিরিস্তাগণ) বললেন, আপনি এমন কাউকে বানাতে চাচ্ছেন, যারা পরস্পর মারামারি ও দূর্নীতি করবে, অথচ আমরা (ফিরিস্তা) আপনার গুণগান ও ইবাদত করছি। তখন তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমি যা জানি, তা তোমরা জান না।" (২:৩০)।

খলিফা শব্দটি দ্বারা মহানবীর (দঃ) উত্তরাধিকারী বুঝানো হয়েছে। তাঁরা নবীর (দঃ) নেতৃত্বের সঙ্গে প্রতিযোগী ছিলেন না, তাঁরা নিজেরা কোন আইন বাতলাতেন না, তাঁদের উপর কোন ওহী নাজিল হতো না। কুরআনি টাইটেলের পথ ধরে তাঁরা কুরআনভিত্তিক শাসন বা উন্নয়ন কায়েম করেছিলেন। যদিও উমাইয়া খলিফাগণ তাঁদের এই উপাধির বলে ধর্মীয় ক্ষমতার যৌক্তিকতা প্রকাশ করতেন। এই পদ্ধতিতে ৪ (চার) জন খলিফা ছিলেন কোরায়েশ বংশের এবং বিশ্বাস ও পূণ্যের সাথে নবী (দঃ) ও ইসলামের খেদমত আনজাম দিয়েছেন। সঠিক পথে পরিচালিত নবীর (দঃ) উত্তরাধিকারী হওয়ার ভিত্তি ছিল, ধর্মীয় জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা, গোত্রীয় কার্যপ্রণালী, খ্যাতি ও স্বচ্ছতা এবং বয়স (বয়োবৃদ্ধ)। কিন্তু এই পদ্ধতিরও সমালোচনা হতো এবং অনেকে দ্বিমত পোষণ করতেন ও সঠিক বলে মনে করতেন না।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, হযরত আলীকে (রাঃ) শহীদ হবার পর ৬৬১ সালে মুয়াবিয়া খলীফার পদ দখল করেন, তিনি দামাস্কাসের চতুর ও শক্তিশালী গভর্নর ছিলেন এবং কোরায়েশদের মাঝেও একটি প্রভাবশালী গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি বংশানুক্রমিকভাবে খলীফা নির্বাচনের পক্ষে ব্যবস্থা নিলেন। এভাবে উমাইয়াদের খলিফা হওয়ার পথ সুগম হলো। মুয়াবিয়ার শাসনভার গ্রহণের ৫০ বছরের মধ্যে ইসলামী সাম্রাজ্য পশ্চিমে স্পেন ও পূর্বে সিন্ধু অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করল এবং মুসলিমদের একত্রিকরণ নাটকীয়ভাবে সম্ভব হলো।

এভাবে মনোনীত খলিফাদের আমলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ধর্মীয় নেতৃত্ব পৃথকীকরণ করা হলো কিন্তু প্রথম চরজন খলিফার আমলে সকল নেতৃত্ব এমনভাবে সম্পৃক্ত ছিল যে, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও নৈতিক সব বিষয় মহানবী (দঃ) এর আদর্শ মোতাবেক পরিচালিত হতো। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে পূণ্যের চেয়ে লাম্পট্যের জন্য খ্যাতিমান হতে দেখা যায় এবং

তখন সমাজ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনার খোঁজ করতে থাকে।

খলিফা ও তাঁর সৈন্যদের জন্য রাজনীতি আলাদা করে ধর্ম সংস্কারকদের কুরানিক ব্যাখ্যা, হাদিস বর্ণনা এবং ইসলামী আইনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করার পরও সুন্নী মতাদর্শের আওতায় সরকার পরিচালিত হয় এবং "আবুল হাছান আল মাওয়ার্দি" খলিফাতত্ত্বকে সমাজের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন।

নৈতিকতার সরকারী রক্ষক (আল-মুহতাসীব): সমাজের রাজনৈতিক ধারক-বাহক এবং নবুয়তের ধারা বজায় রাখার জন্য অপরের অনুগ্রহ অন্বেষণকারী থাকা সত্ত্বেও সর্বোৎকৃষ্ট ইসলাম ধর্ম এমন একজন ধর্মীয় নেতার প্রয়োজন অনুভব করছিল, যিনি বাজারের মধ্যে সাধারণ মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে বলবেন তারা যেন সামাজিক ন্যায় বিচার ও ধর্মীয় স্বচ্ছতা বজায় রাখেন, শ্রদ্ধভাবে পোশাক পরেন, ভাল আচরণ করেন, ধর্মীয়ভাবে পাঁচবার নামাজ পড়েন, মসজিদের ভিতর ইমামকে যেন পাহারা দেয়া হয় এবং সঠিক ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত ধর্মীয় পণ্ডিতকেও পাহারা দিয়ে রক্ষা করা হয়। যারা হাদিসের প্রকৃত ব্যাখ্যাদানকারী তাঁদেরকে অবশ্যই আমরা পৃথকভাবে দেখব এবং যারা নিষিদ্ধ কাজে নিজেকে জড়ায় তাদের যেন কার্যকরি বিচার করা হয়।

ধর্মশাস্ত্রে বিজ্ঞ ও মতবাদ-সর্বস্ব ধর্মতত্ত্ববিদ: যদিও আল ফারাবী কখনই নিজকে ইসলামের মুখ্য ব্যক্তি হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন নি, তথাপি মুসলিম ধারণার মুখ্য বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। যেহেতু আইন প্রদানকারী দার্শনিক মহানবী (দঃ) আর নাই, সেহেতু মুসলিম নেতৃত্ব কেমন প্রকৃতির হওয়া উচিত তা তিনি বলেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত ব্যক্তি (দঃ) এর অবর্তমানে প্রধান কাজ সমাজের বাদশার উপরই বর্তায় যার দ্বারা তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপন মেজাজেই শান্তির বাণী প্রচার করবেন এবং তা বাস্তবায়ন করবেন। নবুওতের ধারা, আল্লাহর আইন, প্রভৃতি কাজকে ভেতর বাহির উভয় দিক থেকেই রক্ষা করবেন। তাঁর কথার অর্থ হলো, ধর্মতত্ত্ববিষয়ক আইন (ফিকাহ) এমন এটি কৌশল যা আইন প্রণেতা কর্তৃক পূর্বে বাহ্যিকভাবে বর্ণিত হয় নি, তা আইন প্রণেতা (দঃ) এর উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে জাতির জন্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা।

যুক্তি সিদ্ধ মতবাদের প্রেক্ষিতে তিনি লিখেছেন যে, তর্ক ও যুক্তি বিদ্যা বিষয়ক মতবাদ হ্যাঁ বোধক বক্তব্য প্রদান করে এবং ধর্ম প্রবর্তক এর বাহ্যিক ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতবাদ প্রকাশ করার পক্ষেই অবস্থান নেয়। এই মতবাদ দুইভাগে বিভক্ত, যেমন- (১) একটি প্রকৃত আমলের বা কাজের উপর ব্যাখ্যাদান করে। এটা ধর্ম থেকে আলাদা, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত নিয়মের এবং তা স্বতঃসিদ্ধ ফলাফলের কথা বলে। ধর্মতত্ত্ব আইন বিদগণ যাকে প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে মেনে নেন, মতবাদের অনুসারীগণ তাকে প্রতিরোধ করেন এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক যুক্তিও মানেন না। যদি উভয়টি একজন মেনে নিতেন, তবে তিনি জুরিষ্ট ও মতবাদ দানকারী হতে পারতেন।

আমরা দেখতে পাই, কোন কোন নেতা নবুয়তের ধারার ঐতিহ্য রক্ষার জন্য প্রথাগতভাবে সংরক্ষন, কার্যকরীকরণ এবং নিত্যদিনের বিষয়বস্তু ব্যবহার ও প্রয়োগ করতেন। এই ধরনের নেতৃত্বের অভাবে ঐতিহ্য বিলীন হয়ে যেতে থাকে; নবুয়তের ধারা ও সর্বশেষ গন্তব্যে পৌঁছার বিষয়গুলো ধীরে ধীরে অন্তর্মিত হতে থাকে। এভাবে এসব মুসলিম নেতা জটিল ভূমিকা পালন করতে থাকেন, স্বর্গীয় আইন ও নবুয়তের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়, রাষ্ট্রের সমর্থন ও অধিকাংশ মানুষের আস্থা, বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিযোগীতার জ্ঞান, পৌড়া নয় এমন ব্যাখ্যা এবং পাবলিকের সামনে যুক্তি তুলে ধরার জন্য বাগ্মীতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রকৃত ধর্মের রক্ষক ও নবায়নকারী (পন্ডিত, আওলিয়া, আল মুজাদ্দিদ): নবুয়তের ধারার ঐতিহ্য মোতাবেক, প্রতি শতকেই ধর্মীয় নবায়নকারী ও শক্তি সঞ্চারকারী হিসাবে মুসলিম সমাজে, আলমুজাদ্দিদের আবির্ভাব দেখা যাবে। আত্ম-উপলব্ধি ও ব্যক্তি-জাগ্রতকরণ, সংরক্ষন ও কার্যকরী করণই যথেষ্ট নয়: নবুয়তের অন্তর্গত ও আসল উদ্দেশ্য বিলীন হতে থাকলেও, সমাজ নবুওতের বাহ্যিক ধারাকে ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষন করতে পারবে। আমরা এভাবে আধ্যাত্মিক পন্ডিতদের তালিকা দেখতে পাই যারা বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ও প্রকৃত ঐতিহ্যকে সার্বিকভাবে নবরূপদান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন; যদিও ঐসময় রাজনৈতিকভাবে ইসলাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে গেছে এবং উত্তরোত্তর উন্নতি করে যাচ্ছে। আমরা এমন একজন আধ্যাত্মিক পন্ডিত ও আউলিয়ার নাম জানি, তিনি হলেন আবু হামিদ আল গাজ্জালি (রঃ)। এই বিখ্যাত পন্ডিত আউলিয়ার সময়কে স্বর্ণযুগ বলা হয়। তথাপিও বলা হয় প্রকৃত ইসলামকে মানুষ ভুলে গেছে অর্থাৎ তা মরে গেছে। যারা ক্ষমতা ও সম্মানের শীর্ষে ছিলেন এবং মহানবী (দঃ) এর উত্তরাধিকারী দাবী করতেন এরকম ওলামাদের বিরুদ্ধে তিনি (গাজ্জালী) সোচ্চার ছিলেন; কারণ ঐ ওলামারা আল্লাহকে উপলব্ধি করার প্রকৃত পর্যায় থেকে সমাজকে বিভ্রান্ত ও ভুলপথে চালিত করেছেন। অপর পক্ষে তারা সম্পদ, সম্মান এবং মানুষের মধ্যে নিজের জ্ঞান ও উৎকর্ষতা প্রচার করতেন। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানকে পুনরায় সাজালেন এবং আইন ক্ষমতা, খ্যাতি ও সুবিধা প্রাপ্তির স্থানগুলিকে চিহ্নিত করলেন যা প্রকৃত বিশ্বাসকে মেঘের মত ঢেকে দিয়েছিল। তিনি ধর্মের বিশুদ্ধ সারাংশকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রূপান্তর করলেন, জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন, অন্তরকে আল্লাহ মুখী করলেন, ইহাই সর্বশেষ গন্তব্য এবং সবকিছুর শেষ।

মাওকের দিদার লাভের পথ

● আবু মোহাম্মদ জাফরুল হক ●

পূর্বপ্রকাশিতের পরঃ

পরিশেষে আমার পীড়াপীড়িতে টিকিতে না পারিয়া বলিলেন- আমি হজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গত তিরিশ বৎসর যাবত কিছু কিছু করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া আসিতেছিলাম। প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হওয়ায় এবার হজে যাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে একদিন কর্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসার পর আমার স্ত্রী বলিলেন-পাশের বাড়ী হইতে মাংসে রান্নার খুশবো আসিতেছে, আপনি যাইয়া আমার জন্য একটু সালুন নিয়া আসুন। তিনি সন্তান সম্ভবা ছিলেন বলিয়া অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পারিলাম না। আমি একটি বাটি লইয়া পাশের বাড়ীতে যাইয়া দেখি এক দরিদ্র বিধবা রমণী চুলায় রান্না বসাইয়াছেন। আর তাঁহাকে ঘিরিয়া কয়েকটি কংকালসার বালক-বালিকা হাড়ির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। আমাকে বাটি হাতে দেখিয়া বিধবাটি বলিলেন-জনাব দুঃখিত, হাড়িতে যাহা রান্না হইতেছে তাহা আপনার জন্য হালাল নহে। এই কচি কচি বাচ্চাদের লইয়া গত সাতদিন যাবত ভূখা থাকার পর নিরুপায় হইয়া অদ্য একটি মৃত হাঁস আবর্জনার স্তূপ হইতে কুড়াইয়া আনিয়া চুলায় বসাইয়াছি। বিধবার কথা শুনিয়া আমি অন্তর হইতে হজের বাসনা মুছিয়া ফেলিলাম। ঘরে গিয়া সঞ্চিত সমুদয় অর্থ আনিয়া তাহাকে দিয়া দিলাম। ইহাই আমার হজ।

কিশোরগঞ্জ জেলার আবদুল কাদির নামক একব্যক্তি ঢাকা রেলওয়ে কলোনিতে বাস করিতেন। তাঁহার পাশের বাসাতেই থাকিত এক মৃত রেল কর্মচারীর বিধবা পত্নী। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ৪-৫টি সন্তান লইয়া তাহার অত্যন্ত কষ্টের ভিতর দিয়া দিন কটিতেছিল। একবার আবদুল কাদির কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়ী গিয়াছিলেন। বাড়ী হইতে আসিয়াই তিনি জানিতে পারিলেন যে বিগত তিন দিন যাবত বিধবার ঘরে চুলায় আগুন জ্বলিতেছে না। আবদুল কাদির বিধবার বড় ছেলেটিকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার হাতে কয়েকটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, তুমি এখনই বাজারে গিয়া কিছু চাল-ডাল নিয়া আস। বালক বাজারে গিয়া চাল-ডাল লইয়া আসিল। তিন দিন পর আবার চুলায় হাড়ি চড়িল। ক্ষুধাক্লিষ্ট কচি কচি বাচ্চাদের মুখে আবার হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল।

সে রাতেই অবদুল কাদির খা'বে দেখেন যে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন-হে আবদুল কাদির, হজরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং তাঁহার রওজা শরিফ জেয়ারতের উদ্দেশ্যে আপনাকে মদিনায় লইয়া যাওয়ার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।

আবদুল কাদির মাত্র আঠারো টাকার বিনিময়ে হজরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রওজা মোবারক জেয়ারত করিয়া আসিলেন। পথের কষ্টও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল ন।

একদা এক বোজর্গব্যক্তি মেঠো পথে ভ্রমণ করার সময় দেখিতে পাইলেন যে মাঠের উপর দিয়া এক খন্ড মেঘ উড়িয়া আসিতেছে। হঠাৎ কে যেন মেঘ খন্ডটির এক পাশ হইতে বলিয়া উঠিল-ওহে আবদুল্লাহর ক্ষেতে আবদুল্লাহর ক্ষেতে। বলার সাথে সাথে মেঘখন্ডটি খানিকটা নিচে নামিয়া আসিয়া একটি টিলার ঢালু এলাকায় একপশলা বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া আবার উপরে উঠিয়া একদিকে চলিয়া গেল। বোজর্গব্যক্তি টিলার নিকটে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে বৃষ্টির পানি গড়াইয়া একটি গর্তে যাইয়া সঞ্চিত হইতেছে এবং একব্যক্তি তাহা গম ক্ষেতে সিঞ্চন করিতেছে। তিনি লোকটির কাছে গিয়া পরিচয় জানিতে চহিলে সে বলিল- আমার নাম আবদুল্লাহ। কথা প্রসংগে আবদুল্লাহ বলিল-আমার মাত্র এই এক খন্ড জমি। ইহাতে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহা তিন ভাগ করি, একভাগ চাষাবাদ এবং খাজনার জন্য। একভাগ নিজেরা খাই বাকী একভাগ পাড়ার একটি এতিম পরিবারের ভরণপোষণে ব্যয় করি, শুনিয়া বোজর্গব্যক্তি মনে মনে বলিলেন-ও এজন্যই আবদুল্লার ক্ষেতে আবদুল্লার ক্ষেতে আওয়াজ হইতেছিল।

খোরাসানের মার্ভ শহরে মেয়র হাজী নামে এক বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। যৌবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং নির্মম। কোন এক ঘটনার পর হইতে তাঁহার মনের পরিবর্তন ঘটে এবং নানা জনহিতকর কার্যে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করা আরম্ভ করেন। একদা তিনি ভৃত্যসহ বাজারে যাওয়ার সময় পথে একটি চর্মরোগগ্রস্থ দুর্বল কুকুর দেখিতে পাইয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেণ-আহা, ইহাও আল্লার একটি সৃষ্টজীব এবং দুনিয়াতে সুখ ভোগ করার অধিকার তাহার রহিয়াছে, বলিয়া তিনি কৌশলে কুকুরটিকে পাকড়াও করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। কয়েকদিন নিয়মিত সেবাযত্নের পর তাহার শরীর ভাল হইয়া গেল।

ইহার কিছু দিন পর মেয়র হাজী মারা গেলেন। একদিন স্থানীয় জনৈক ধার্মিক ব্যক্তি খা'বে দেখেন যে হজরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মে'রাজের বাহন

বোরাকের উপর মেযর হাজী অত্যন্ত জাঁকজমকের সংগে বসিয়া আছেন। তাঁহার ছেলে-মেয়েরা দুই দিক হইতে তাঁহার হাত ধরিয়া সামনে পেছনে সহাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছে। কিছুক্ষণ পর বেহেশতের একটি বাগানের ভিতর দিয়া যাওয়ার সময় ধার্মিক ব্যক্তি তাঁহাকে সালাম দিয়া জানিতে চাহিলেন-জনাব, কোন্ পুণ্যবলে আপনি এরূপ উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছেন? মেয়র হাজী বলিলেন-ভাই, সারাজীবন ব্যাপী আমি বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে অকাতরে যে অর্থ ব্যয় করিয়াছি, তাহা কোন কাজেই আসে নাই। আমাকে দোজখে লইয়া যাওয়াই সাব্যস্ত হইয়াছিল। যখন ফেরেশতাগণ আমাকে দোজখে লইয়া যাওয়ার জন্য পাকড়াও করিল, তখন আল্লাতা'লা হঠাৎ গায়েব হইতে বলিলেন-হে মেয়র হাজী, তুমি সব গর্ববোধ ত্যাগ করিয়া একটি পীড়িত কুকুরের প্রতি যে করুণা প্রদর্শন করিয়াছিলে, তারজন্য তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করা হইল। হে ফেরেশতাবৃন্দ, তোমরা মেয়র হাজীকে বেহেশতে লইয়া যাও।

কোন এক ঈদের দিন হজরত সর্‌রি সকতি রহমতুল্লাহ আলাইহে একটি দরিদ্র বালক-কে রাস্তার উপর বসিয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া স্নেহমাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন-বৎস, তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন? বালক বলিল-আজ ঈদের দিন, সকলেই নূতন জামাকাপড় পরিয়া আমোদ-প্রমোদ করিবে, আর আমার কিছুই নাই। তিনি বলিলেন-তোমার আব্বা-কে বলিলেই তো তিনি কিনিয়া দিতে পারেন। বালক বলিল-আমার আব্বা-আম্মা বাঁচিয়া নাই। বালকের কথায় তাঁহার অন্তরে করুণার উদ্রেক হইল। তাঁহার হাতে তখন কোন টাকা পয়সা ছিল না। অগত্যা তিনি খেজুর বাগানে গিয়া প্রচুর খেজুর বিচি সংগ্রহ পূর্বক সেগুলি বাজারে বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তাহাকে এক প্রস্থ সুন্দর পোষাক ও কিছু আখরোট কিনিয়া দিলেন। বালক তাহা পাইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। ইহার পরক্ষণেই হজরত সর্‌রি সকতি রহমতুল্লাহ আলাইহের অন্তঃকরণে এক জ্যোতির সঞ্চার হইল এবং তাঁহার জীবনের ধারা পরিবর্তন হইয়া গেল।

একদা হজরত আবুল কাশেম নসরাবাদী রহমতুল্লাহ আলাইহে পদব্রজে মক্কা শরীফ যাওয়ার সময় পথে একটি ক্ষুধার্ত কৃশকায় কুকুর দেখিতে পাইয়া তাঁহার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হইল। কিন্তু সংগে কোন খাদ্যসামগ্রী না থাকায় তিনি অন্যান্য যাত্রীদেরকে শুনাইয়া বলিলেন-কে এমন দয়ালু ব্যক্তি আছেন যে চল্লিশ হজের পরিবর্তে একটি রুটি দিতে পারেন? শুনিয়া যাত্রীদের মধ্যে একজন বলিলেন-হাঁ আমি দিতে পারি। তিনি লোকজন সাক্ষী রাখিয়া উপরোক্ত শর্তে লোকটির নিকট হইতে একটি রুটি গ্রহণ করিয়া কুকুরটিকে খাইতে দিলেন।

একদা হজরত খাজা আলী সিরজানি রহমতুল্লাহ আলাইহে হজরত শাহ সুজা কেরমানি রহমতুল্লাহ আলাইহের মাজার জিয়ারতের পর কিছু শিরনি বিতরণের উদ্দেশ্যে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া একজন মেহমান পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ-পাকের দরবারে আরজি পেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার সামনে একটি কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি উহাকে তাড়াইয়া দিয়া বলিলেন-হে সৃষ্টির আরজি শ্রবণকারী, আমার মেহমান কোথায়? আল্লাহপাক গায়েব হইত বলিলেন-মেহমান আপনার আরজির সংগে সংগেই পাঠাইয়াছলাম আপনি তো তাড়াইয়া দিলেন। তিনি লজ্জিত হইয়া সাথে সাথে কুকুরটির অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজির পর একস্থানে উহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন-হে কুকুর, আমার সংগে কিছু খাদ্য আছে, চল একসংগে আহার করা যাক। কুকুর নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিল-এখন আর আমার কিছুই খাওয়ার ইচ্ছা নাই। তবে আপনার প্রতি আমার উপদেশ এই যে মেহমানের জন্য আল্লাহতা'লার দরবারে আরজি পেশ করার পূর্বে আপনার অন্তর্দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আরজি পেশ করুন, তাহাই আপনার জন্য উত্তম হইবে।

বাদশাহ নামদার, অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, লোকে চাবির তালাসে সঠিক পথে না গিয়া কেবল মসজিদের অভ্যন্তরে এবং কোরআনের গন্ডীতেই তাহা অন্বেষণ করিতেছে। লোকে মসজিদের নির্লিপ্ততায় জীবনের সন্ধান না পাইয়া উহাকে সাংসারিক কোন্দলের আখড়া বানাইয়া লইয়াছে। লোকে 'ইসমে আজম' সমেত সমগ্র কোরআন গলাধঃকরণ করিয়াও অন্তর্নিহিত হেকমত অনুধাবনে কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিয়া উহার নিছক আক্ষরিক ব্যাখ্যা এবং ব্যাকরণগত উচ্চারণগত বিতর্কের মধ্যেই প্রাণশক্তির অপচয় করিতেছে। ইহার মূল্যবান রত্নরাজি দ্বারা জিন-ভূতের আছর ছাড়ানো, নানা মন্দ অভিপ্রায়ে লোকের মনের গতি ফেরানো, মামলা-মোকদ্দমায় কামিয়াবি অর্জন, লোকজনকে বাণ মারিয়া প্রাণ সংহার ইত্যাদি পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। সুরা-কেরাতগুলিকে দোকান, বাসগৃহ, শরাবখানা, গাঁজা-ভাংগের দোকান, বাস,ট্রাক ইত্যাদিতে চিত্রকর দ্বারা আলংকারিক অক্ষরে লেখাইয়া তাহার নিচে বসিয়াই অত্যন্ত দক্ষতার সহিত লোকজনকে ফাঁকি দিতেছে, নিজের পরিবরবর্গকে ফাঁকি দিতেছে, নিজেকে ফাঁকি দিতেছে। (চলবে)

আত্মার স্বরূপঃ
ইসলামী চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের পুনঃজীবন

মূল : এম. ফেতুল্লাহ গুলেন
অনুবাদ : মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

[এম. ফেতুল্লাহ গুলেন বর্তমান যুগের একজন প্রভাবশালী ইসলামী চিন্তাবিদ, পন্ডিত লেখক, বাগ্মী ও আদর্শ প্রচারক এবং সমাজ সংস্কারক। তুরস্কের এ মহান পন্ডিত লেখক বর্তমানে আমেরিকায় বসবাস করেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৬০টি। তিনি ইসলামের শাশ্বত মর্মবাণী– যা পুরনো হয়েও চির আধুনিক, যা মানবিকতার সকল দিককে উন্মোচিত করেও গভীর ভাবে আধ্যাত্মিক, যা ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করেও সমষ্টির স্বার্থকে সংরক্ষণ করে, যা একাধারে ব্যক্তির মুক্তিকামী হয়েও বিশ্ব মানবতার জাগরণকামী, যা দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে ভারসাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার স্রষ্টা প্রদত্ত হাতিয়ার - তারই স্বরূপ উন্মোচন করেন একান্ত এক নিজস্ব ভঙ্গীতে, লেখায় ও বক্তৃতায়। সে মহান ব্যক্তিত্বের সাথে বাংলাদেশী পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মাসিক আলোকধারার পক্ষ থেকে তাঁর রচনার কিছু অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।]

পূর্বপ্রকাশিতের পর

ঐশী প্রেম আমাদের মাঝে এ বোধটি জাগ্রত করে দেয় যে আমরা আমাদের মহান প্রভুর সামনেই হাজির আছি। আমাদের অবস্থান নির্ণীত হয় তাঁর সাথে রচিত সম্পর্কের ভিত্তিতে। তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন আমরা এ আনন্দে আপ্লুত হই। তাই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই সকল সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সৃষ্টির অস্তিত্বের কারণও আনন্দ। তাঁর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনই সৃষ্টির আকুতি। আল্লাহর প্রতি এ ভালবাসা অনন্ত শক্তির উৎস। পৃথিবীর উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে এ উৎসকে অবহেলা করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। বরং এ উৎস থেকে জীবনরস সংগ্রহ করা ও তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করাই তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পাশ্চাত্য এ ভালবাসার সাথে পরিচিত তবে তা বস্তুবাদের বর্ণিল রঙে রঞ্জিত। তাদের এ পরিচিতি ঘটেছে দার্শনিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, দর্শন শাস্ত্রের ধোঁয়াটে ও অস্বচ্ছ পরিমন্ডলে তারা এ ভালবাসার স্বাদ অনুভব করে। এর ফলে তাদের অভিজ্ঞতায় জুড়ে থাকে সন্দেহ, সংশয়, সিদ্ধান্তহীনতা ও অনিশ্চয়তা। আমাদেরকে তাই সৃষ্টির অস্তিত্ব ও উৎসকে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর নিরিখে। কুরআন ও সুন্নাহর ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালার ভিত্তিতে বিশাল সৃষ্টি জগতের গঠন কাঠামো ও এর রহস্যময়তা নির্ণয় করতে হবে আমাদের। এভাবেই আমরা আমাদের সে ভালবাসার স্বাদ অনুভব করতে পারব, যার অমলিন শিখা আমাদের অন্তরে প্রজ্বলিত হয়ে আছে, যা আমরা আমাদের স্রষ্টার জন্য অনুভব করি, যার মাধ্যমে আমরা তাঁর সাথে সংহতি প্রকাশ করি, তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। তাঁর প্রতি ভালবাসারই সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি আমাদের ভালবাসা। মানুষের আদি উৎস, বিশ্বজগতে তার অবস্থান, অস্তিত্বের উদ্দেশ্য, অনুসরণযোগ্য পথ ও পরিণতি ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর রত্নভান্ডারে যে সাবলীল বর্ণনা রয়েছে তা মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা, অনুভূতি, চেতনা ও প্রত্যাশার সাথে এতবেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, তা পরিপূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করার পর চমৎকৃত ও বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারা যায়না।

জাগ্রত হৃদয়ের অধিকারীদের পক্ষে প্রজ্ঞা ও হিকমতের এ দু'টো উজ্জ্বল উৎস উদ্দীপনার উচ্ছল ঝর্ণাধারা ও আকর্ষণের খনি। স্বচ্ছ অন্তর ও আন্তরিক অনুভূতি সহকারে সংকট ও স্বস্তিতে যারা এ দু'টো উৎসের প্রতি মনোনিবেশ করে তারা কখনো খালি হাতে ফিরেনা এবং যারা এ দু'টোতে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা মরেও হয়ে থাকে অমর। এখানে যাঁদের কথা বলা হচ্ছে তাঁদের জন্য তা যথেষ্ট হবে যদি তাঁরা সেই একই নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ সহকারে কুরআন ও সুন্নাহ-তে মনোনিবেশ করেন, যে নিষ্ঠা ও গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ইমম গাজ্জালী, ইমাম রব্বানী, শাহওয়ালীউল্লাহ অথবা বদিউজ্জমান সাইয়িদ নুরসী। অথবা তাঁরা যদি সেই একই উৎসাহ আবেগ উদ্দীপনার সাথে কুরআন সুন্নাহর প্রতি ধাবিত হন যেভাবে ধাবিত হয়েছিলেন মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী, শায়খ গালিব, মুহাম্মদ আকিফ। অথবা সেই একই ঈমান ও কর্মের দৃঢ় সমন্বয়ে এগিয়ে যান যেভাবে এগিয়ে গেছেন খালিদ বিন

ওয়ালিদ, উকবা বিন নাফি, সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী, সুলতান মাহমুদ গজনবী ও সুলতান দ্বিতীয় সেলিম। তাঁদের সকলের সম্মিলিত উদ্দীপনা যা দেশ ও কালকে প্লাবিত করে দিয়েছিল সেই অতুলনীয় উদ্দীপনাকে উপজীব্য করে যুগের চাহিদা, মানস ও কর্মপদ্ধতিকে অবলম্বন করে কুরআনকে বুঝা ও বুঝাবার দায়িত্ব নিতে হবে যে কুরআন চিরনূতন যা কখনো পুরানো হয়না। একটা সর্বব্যাপী ও সার্বজনীন আধ্যাত্ম শরাফত নির্মাণে তা হবে আমাদের জন্য দ্বিতীয় পদক্ষেপ। পৃথিবীর উত্তরাধিকারী গণের তৃতীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য হবে বিজ্ঞান অনুশীলনে ব্রতী হওয়া। এর জন্য প্রমাণ, যুক্তি ও জাগ্রত চেতনার ত্রিমুখী সমন্বয় ঘটাতে হবে। এমন এক যুগে যখন পৃথিবীর অধিবাসীরা ঘোরতর এক আচ্ছন্নতার ভেতর মজে আছে সেখানে বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রতি যথাযথ অনুরাগ জন-প্রয়োজনীয়তার প্রতি উপযুক্ত সাড়া প্রদান বটে। অন্যদিকে মানব মুক্তির জন্যও তা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রূপে বিবেচিত হবে। বদিউজ্জামান বলেছেন, যুগের শেষে মানুষ তাদের আয়ত্বাধীন সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি ঝুঁকে পড়বে, জ্ঞানকেই তারা শক্তির উৎস বানাবে, বিজ্ঞানের হাতেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত হবে, ফাছাহা, বালাগাত ও অলংকার শাস্ত্রের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে যাবে। জ্ঞান বিজ্ঞান উন্মেষের আরেকটি যুগ আমরা দেখতে পাব। অনুমান নির্ভর ঘোলাটে পরিস্থিতি কাটিয়ে সত্যে উপনীত হতে হলে এবং আপাত সত্যের অন্তরালে পরম সত্যকে পেতে বা বুঝতে হলে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কোন বিকল্প নেই। বিগত কয়েক যুগের শূন্যতা কাটিয়ে জ্ঞান ও দক্ষতায় পূর্ণতা অর্জন করে, যুগের প্রহারে অবচেতন মনে অর্জিত সকল ঘাটতি ও ক্ষত পুষিয়ে তোলা, সবকিছু নির্ভর করছে বৈজ্ঞানিকভাবে নিজেদের চিন্তাধারা ও বক্তব্যকে পেশ করার ওপর। আর সে চিন্তাধারা ও বক্তব্যকে সাজাতে হবে ইসলামী মননশীলতার দর্পনে।

চলার পথ ও লক্ষ্যবস্তু আগেভাগে নির্ধারিত না থাকায় নিকট অতীতে আমাদের সকল জ্ঞান চর্চা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান নির্ভর ও বস্তুবাদী দর্শনের ওপর প্রতিস্থাপিত ছিল। ফলে আমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় চরম হ য ব র ল অবস্থা বিরাজ করছিল এবং বৈজ্ঞানিকদের স্বতস্ফুর্ততায় অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। এ শূন্যতাকে কাজে লাগিয়েছিল বিদেশীরা। তারা আমাদের দেশের (তুরস্কের) আনাচে কানাচে স্কুল সহ নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা আমাদের প্রজন্মের মধ্যে বিদেশী মনোভাব ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

আমাদের দেশের অনেক লোক বিদেশীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের মেধাবী ও চৌকষ সন্তানদের ভর্তি করায়। এটা ছিল তাদের হীনমন্যতার ফল। এতে তাদের ছেলে মেয়েরা তাড়াতাড়ি শিকড় বিচ্ছিন্ন ও বিদেশানুগামী হয়ে পড়ে। কিছু দিন পর তাদের মন ও জীবন থেকে ঈমান ও ধর্ম উধাও হয়ে যায়। এ তরুণ, অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীরা আনুগত্যহীন প্রজন্মে পরিণত হয়। ঈমান ও ধর্ম বিনষ্ট হয়ে সারা জাতির মনমানসে ধর্মহীনতা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে বেপরোয়াভাব এসে যায়। কথায় কাজে, চিন্তা চেতনায় ও শিল্প দর্শনে তারা সস্তা আত্ম অহমিকার শিকার হয়ে পড়ে।

এর কারণ ছিল সুস্পষ্ট। ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা নির্বিচারে কোন প্রকার চিন্তা ভাবনা ছাড়াই আমাদের ছেলেমেয়েদের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে সোপর্দ করে দিয়েছি। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনা শিক্ষা দেয়ার পূর্বে ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দিয়েছে আমেরিকান কালচার, ফরাসী নৈতিকতা, ইংরেজিপনা ও ঐতিহ্য। ফলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম তাদের যুগের বিজ্ঞান পদ্ধতি ও প্রযুক্তি সম্মত চিন্তা চেতনার পরিবর্তে নানা দল শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে মার্কসবাদ, লেলিনবাদ ও মাওবাদের অনুসারী হয়ে পড়ে। কেউ কেউ কমিউনিজম ও সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। কেউ কেউ ফ্রয়েডবাদের জটিল চক্রে নিপতিত হয়ে পড়ে, কেউ হয়ে পড়ে অস্তিত্ববাদের শিকার ও সার্থের অনুগামী। কেউ কেউ মারকিউজের বাণী উচ্চারণ করতে করতে মুখে ফেনা তুলতে থাকে, কেউ কেউ কামুর চিন্তাধারায় উন্মত্ত হয়ে জীবন বরবাদ করতে থাকে। এর সবকিছুই আমাদের দেশে নির্বিচারে চর্চিত হয়েছে। এ সমস্ত চিন্তা চেতনার ধারক বাহক ও পৃষ্ঠপোষক ছিল ঐ সমস্ত তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ। সেই নিদারুন সংকটময় পরিস্থিতিতে কিছু বিপথগামী মানুষ তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল তাদের সার্বক্ষণিক তৎপরতা ছিল ধর্ম ও ঈমানের বিষয়গুলোকে কালিমা লিপ্ত করা। এর শিক্ষাকে নিন্দা-মন্দ করা। এভাবে তারা নিজেদের অজান্তে কিংবা উদসীনতায় পশ্চিমা নগ্নতা ও উম্মাদনাকে প্রকাশ্যে সামনে নিয়ে এসেছিল। অবশ্যই সেই সময়ের সংকট ও সর্বগ্রাসী থাবার আক্রমণ আমাদের পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। দেশ ও জাতির স্বার্থ পরিপন্থী এ পরিস্থিতি যারা সৃষ্টি করেছিল তারা জাতির বিবেকের কাছে জঘন্য অপরাধী হিসাবে চিরদিন ধিকৃত হবে।

অতীতের এ মসীলিপ্ত অধ্যায় ও কালো ইতিহাস

সৃষ্টিকারী কুশীলবদের কর্মকান্ড, যা এখনো আমাদের মনকে পীড়িত ও হৃদয়কে ব্যথিত করে, সে সব এক পাশে ঠেলে রেখে আমরা এখন সেই সমস্ত কর্মবীরদের চিন্তাশীলতা নিয়ে আলোচনা করতে চাই যা আমাদের ভবিষ্যত নির্মাণে অবদান রাখবে।

বৈজ্ঞানিক চেতনা ও মননশীলতায় আমাদের তরুণ প্রজন্মকে উজ্জীবিত করে আমাদের জাতির উত্থান ও রেনেসাঁ ঘটাতে হবে। এ সত্যটি আমরা অতীতেও উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, পেরেছিলাম পাশ্চাত্য সমাজের অনেক পূর্বেই।

অতীতে আমাদের জাতির যে দুর্ভাগ্যজনক নিয়তিকে বরণ করতে হয়েছিল তার দুঃসহ স্মৃতি ও বেদনাবিধুর পরিস্থিতি এখনো আমাদের সম্মিলিত বিবেককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দীর্ঘদিন ধরে বিদেশী আধিপত্য আমাদের বেদনা বোধকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছিল। তখন জাতি যে নিপীড়ন, নির্যাতন, বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হয়েছিল সে কথা স্মরণ হলে তারা এখনো হযরত আদম (আঃ) এর মত আহাজারী করে, তাদের মনোবেদনা ও অনুতাপ হয়ে পড়ে হযরত ইউনুস (আঃ) এর মত, তাদের দুর্ভোগ ও কষ্ট হয়ে দাঁড়ায় হযরত আয়ুব (আঃ) এর দুর্ভোগ ও কষ্টের সমতুল্য। এ রকম অবর্ণনীয় হাহাকার, আহাজারি মনোবেদনা দীর্ঘশ্বাস, কষ্ট, দুর্ভোগের পর যে চিন্তা চেতনার উদ্ভব ঘটেছে, যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি, আমাদের প্রচেষ্টা ও ঘটনাবলী নির্দেশ করছে যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সময় ক্রমশ এগিয়ে আসছে, এমনকী তা হতে পারে অতীব সন্নিকটবর্তী।

পৃথিবীর উত্তরাধিকারীগণের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হবে তারা মানবজাতি, জীবন ও বিশ্বজগত সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর পুনর্মূল্যায়ন করবে। নিজেদের সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং দোষ ও গুণের পর্যালোচনা করে নেবে।

এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় প্রণিধান যোগ্যঃ

ক. সমগ্র বিশ্বজগত প্রকান্ড এক খোলা গ্রন্থের মত। মহান স্রষ্টা নিজেই মানুষের চোখের সামনে তা উন্মুক্ত করেছেন যাতে বারবার তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। সৃষ্টির ব্যাপকতা ও অস্তিত্বের গভীরতা অবলোকনের জন্য মানুষ হচ্ছে দর্পন স্বরূপ। মানুষের মাঝেই নিহিত আছে জগত সমূহের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য সুস্পষ্ট সূচীপত্র। জীবন একটি বিকাশমান ধারা, এর সুগঠিত রূপ ও মাহাত্ম্য আছে। সেই বিশাল গ্রন্থ ও সূচীপত্রের জারকরসে পরিশোধিত করে এর মর্মার্থ বুঝতে হবে। এতে ঘটেছে স্বর্গীয় অভিপ্রায়ের প্রতিফলন। বাহ্যিক রূপ ও রঙ্গ দেখে যদিও মানুষ, জীবন ও বিশ্বজগতকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বিষয় রূপে বিবেচনা করা যায় তথাপি বুঝতে হবে এর সবগুলোই একই মূল সত্যের বিভিন্ন রূপ মাত্র। এটাই বাস্তবতা। যদি আমরা এগুলোর একটা থেকে অন্যটাকে পৃথক করে ফেলি তাহলে অবশ্যই সৃষ্টির মাঝে বিরাজিত নিবিড় ঐক্যের সূরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে সামগ্রিক সত্যকে উপলব্ধি করতে আমরা ব্যর্থ হব। এটা অবশ্য মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি অন্যায় অবিচার ও অসম্মানের সামিল।

আল্লাহর বাণী পাঠ করা, উপলব্ধি করা, পালন করা ও এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আত্মসমর্পন করা আমাদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ বাণী উৎসারিত হয়েছে প্রকাশ ক্ষমতার স্বর্গীয় গুণাবলীর অভ্যন্তর হতে। তাই এটাও আমাদের কর্তব্যের অপরিহার্য অংশ যে, আল্লাহকে চিনতে ও বুঝতে হবে সমগ্র সৃষ্টির পটভূমিতে। এ সৃষ্টি সজ্জিত হয়েছে তাঁরই জ্ঞান ও ইচ্ছায়, তাঁরই শক্তি ও ক্ষমতায়। আর এভাবেই সমগ্র সৃষ্টি ও সংঘটনের মধ্যে সংগতি, সংহতি সাদৃশ্য ও ঐক্যের অনুসন্ধান করতে হবে আমাদের।

সূফি উদ্ধৃতি

■ যার মনে খোদাভীতি বিদ্যমান সে সৎপথ লাভ করে, কিন্তু তার বিপরীত ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। যারা দরবেশীকে ভীতির নজরে দেখে তারা খোদার গজবে পতিত হয়ে থাকে।

■ বন্ধুর বিচ্ছেদ অপেক্ষা হৃদয় বিদারক কিছু এ জগতে আছে বলে মনে হয় না।

–হযরত যুননুন মিসরী (রহঃ)

■

আল্লাহ মানুষকে হৃদয়ের কাঠিন্যতা ও আল্লাহ থেকে উদাসীনতা অপেক্ষা কোন নিকৃষ্ট ব্যাধি দেন নি।

– হযরত ফতেহ মুছেলী (রহঃ)

সূফি দর্শন ও নৈতিকতা

● ড. জিনবোধি ভিক্ষু ●

পূর্বপ্রকাশিতের পর:

ধৈর্য (সবর) ঃ মানবের জাগতিক এবং আত্যন্তিক দুঃখ, বিপদ ও দূরবস্থার মধ্যে মনের ভারসাম্য রক্ষা করাই ধৈর্য নামে অভিহিত। জ্ঞানীগণ বলেন- ধৈর্যই ধর্ম। প্রসন্ন বদনে দুঃখ-যন্ত্রণা বরণ করা, অবৈধ কার্যাবলি হতে বিরত থাকা, অদৃষ্টের আঘাত নীরবে সহ্য করা, দারিদ্রের মধ্যে মানবিক ভারসাম্য সংরক্ষণ করা, নীরবে নির্দ্বিধায় বিপদ গ্রহণ করে নেয়া, আল্লাহর প্রতি আস্থার দৃঢ়তা এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিপদ হাসিমুখে পরম ধৈর্যের সাথে পরিগ্রহণ করাকে বোঝায় (দার্শনিক প্রবন্ধাবলি, বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫)। ধৈর্য দুই প্রকার যথাঃ (১) দৈহিক যেমন শারীরিক পীড়া সহ্য করা যা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যেমন আঘাত সহ্য করা ইত্যাদি। এ শ্রেণীর ধৈর্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং (২) আত্মিক। এটি মানুষের প্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযত করে। ধৈর্যের ব্যাপক তাৎপর্যের আলোকে আমরা নিম্নোক্ত হাদিসের উক্তিটি অনুধাবন করতে পারি; ঈমান হলো সবরের নাম। এ শ্রেণীর সবর উত্তম ও প্রশংসনীয়। ধৈর্যের শক্তির তারতম্য ভেদে মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা (১) অতি অল্প সংখ্যক, যাঁদের মধ্যে ধৈর্য স্থায়ীগুণ হিসেবে অবস্থিত, তাঁরা সিদ্দিকুন এবং মুকাররাবুন নামে অভিহিত। (২) যাদের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তি অধিক শক্তিশালী এবং (৩) যাদের দুটো পরস্পর বিরোধী বাসনা অনবরত সংগ্রামরত-এ শ্রেণী মুজাহিদুল নামে পরিচিত (দার্শনিক প্রবন্ধাবলি, বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫)। ইমাম গাজ্জালী (রহ) বলেন, ধৈর্য শয়তানের প্ররোচনা এবং আত্মার নিম্নতর প্রবৃত্তি সম্পর্কে আল্লাহর হুঁশিয়ারিতে পূর্ণ বিশ্বাস (সূফি সাধনার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮)। প্রলোভন জয় করে বিপদ বাধা অতিক্রম করে আল্লাহর প্রেমের পথে টিকে থাকার এক পরম টনিক হলো ধৈর্য।

প্রেম (ইশকে আল্লাহ) ঃ প্রেম মাত্রই স্বর্গীয় সুধা। অন্তরের প্রেমশক্তি দিয়ে সবকিছু জয় করা যায়। রাজশক্তি বা বাহুশক্তির চেয়ে প্রেমশক্তি বড়। আল্লাহর প্রেমই সূফিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সূফিদের হৃদয় সবসময় আল্লাহর চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন থাকে। আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের জন্য তারা সর্বক্ষণ থাকেন উন্মুখ। জাগতিক কোন বিষয় সম্পদই তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ ভক্তি ও প্রেমের উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপের কারণে সূফিবাদকে প্রেমধর্ম বা প্রেমদর্শন নামেও অভিহিত করা হয় (দার্শনিক প্রবন্ধাবলি, বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬)। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত একজন মরমী কবি ইশকে অর্থাৎ প্রেম আল্লাহর বিষয়টি কাব্যিক ছন্দে সুন্দরভাবে হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করেছেন:

ভালো যদি বাসতে হয় তাকেই ভালোবাসো
যে জন প্রেমময়।
(সূফি সাধনার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯)।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই একই কথাই ব্যক্ত হয়েছে:

"দুঃখের বেশে এসেছো বলে নিবিড়
করিয়া ধরিব হে।"

আল্লাহর সাথে ভক্তের প্রেমের রসঘন উচ্ছ্বাস পৃথিবীর বহু ভাষায় ও সাহিত্যে উচ্চারিত হয়েছে। সূফিদের ইশকের দ্বারা বিশ্বের কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও জ্ঞানী গুণী সবাই প্রভাবিত (দার্শনিক প্রবন্ধাবলি, বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬)।

সূফিদর্শনের মূল শক্তি হচ্ছে প্রেম। প্রেমই সূফিকে প্রেমাস্পদ আল্লাহকে পাওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে কাজ করে। মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের উপায় হচ্ছে এই মহান প্রেম। এর সমুদয় অর্থকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা (১) ঐশী প্রেম এবং (২) জাগতিক প্রেম।

ঐশী প্রেম (ইশকে ছাদেকী) ঃ ঐশী প্রেমকে পরম সত্তার প্রেম বা আল্লাহর প্রেম বলা হয়। যে প্রেম মানবত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটায়। ঐশী প্রেম সম্পর্কে জালাল উদ্দীন রুমী বলেন, 'ঐশী প্রেম সর্বব্যাধির মহৌষধ। এই প্রেম আত্মাকে পবিত্র করে তোলে এবং উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। ঐশী প্রেমের বলেই মাটির দেহ আকাশে উন্নীত হয়। (বাংলাদেশে সূফি দর্শনের রূপরেখা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭)। ইবনুল আরাবী বলেন, ঐশী প্রেমই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদরূপী মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটায় এবং সমগ্র সত্তার ঐক্য অনুভব করায়। মানবাত্মার উৎস হচ্ছে পরমাত্মা। সৃষ্টির আদিতে মানবাত্মা-পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর থেকে কেবল তার সাথে মিলিত হবার জন্য যে

আকর্ষণ অনুভব করে তাঁকে বলা হয় প্রেম (বাংলাদেশে সূফি দর্শনের রূপরেখা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭)। জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে সূফি দর্শনের এই প্রেমই হচ্ছে দিব্যজ্ঞান। ঐশী প্রেম সম্পর্কে ইবনে সিনা বলেন, প্রেম বিশ্বতাত্ত্বিক নিয়ম ও প্রকৃতির কার্যকরী শক্তি প্রেম পরম সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি সত্তার অমরতা অর্জনের শক্তি যোগায় (বাংলাদেশে সূফি দর্শনের রূপরেখা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭)। এই প্রেমই ব্যক্তিকে অমরতা অর্জনে সাহায্য করে সে কথা নব্য সূফিরাও মনে করেন ঐশী প্রেমই প্রেমাস্পদ আল্লাহকে পাবার একমাত্র উপায়।

জাগতিক প্রেম (ইশকে মহাজি) ঃ নব্য সূফিগণ জাগতিক প্রেমকে ঐশী প্রেম লাভের উপায় বলে গণ্য করেন। কেননা তাদের মতানুসারে ষড়রিপুকে জয় করে কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করতে পারলেই কেবল একজন মানুষের পক্ষে ঐশী প্রেমে উত্তরণ করা সম্ভব। প্রকৃতি প্রেম এবং মানবপ্রেম হচ্ছে ঐশী প্রেমে উত্তরণের প্রাথমিক স্তর বা ধাপ। এ স্তরকে অতিক্রম করতে না পারলে ঐশী প্রেমে উত্তরণ কখনোই সম্ভব নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে নব্য সূফিবাদে জাগতিক প্রেম হচ্ছে ঐশী প্রেমে উত্তরণের উপায় (বাংলাদেশে সূফি দর্শনের রূপরেখা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭)।

ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট গবেষক আহম্মদ শরীফ তাঁর একটি গ্রন্থে লিখেছেন সূফিধর্ম হচ্ছে প্রেমবাদ। সে প্রেম আল্লাহপ্রেম। আরাধ্য আল্লাহ বটে, কিন্তু এর মানবিকতাই প্রেম সাধনার প্রথম পাঠ। সৃষ্টি প্রেমেই স্রষ্টা প্রেমের বিকাশ। মরণ নদীর এপারে ওপারে ব্যাপ্ত জীবনের নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধিতেই এ সাধনার সিদ্ধি (বাঙ্গলার সূফি সাহিত্য, আহম্মদ শরীফ, সময় প্রকাশ, ঢাকা ২০০৩, পৃঃ ২১)।

কৃতজ্ঞতা (শোকর) ঃ কৃতজ্ঞতা মানুষের মহৎ গুণ। বড় হতে চাইলে কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা চাই। সূফি সাধকের একটি বড় নৈতিকতা হলো কৃতজ্ঞতা। সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রদত্ত নীতি নিয়মের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সূফি সাধনার অন্যতম মূলনীতি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা শোকরিয়া আদায় কর'। রাসূলাল্লাহ (দঃ) মুমিন সম্পর্কে বলেছেন, "তার আনন্দ উপস্থিত হলে সে শোকরিয়া আদায় করে"। এ পৃথিবীতে দু প্রকারের মানুষ বড়ই দুর্লভ। প্রথমতঃ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ কল্যাণমিত্র। একজন ব্যক্তির জীবন আলোকিত ও প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে জ্ঞানী গুণী কারো না কারো সাহায্য সহানুভূতির বিশেষ প্রয়োজন। প্রকৃত অর্থে সহানুভূতি ছাড়া কোন মানুষের জীবনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। কেউ যদি মনে করেন যে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছি সবই আমার একক প্রচেষ্টার ফল। এ শ্রেণীর মন-মানসিকতাসম্পন্ন মানুষকে সাধারণ দৃষ্টিতে বলা হয় অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক। বর্তমান সমাজে বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ লোকের অভাব নেই। বিবেকবান মানুষ হিসেবে পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশই হচ্ছে মানবতা ও মনুষ্যত্বের বহিপ্রকাশ। ইদানিং কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণকামী মানুষের সংখ্যা বেশি। ঠকানো যত সহজ উপকার করা তত সম্ভব নয়। কারণ আত্মভোগ ও আত্মসুখ বর্তমান সমাজে প্রাধান্য পেয়েছে। আন্তরিকতা এবং উন্নত মানসিকতা না থাকলে প্রকৃত অর্থে অন্যের ভাল বা কল্যাণ করা খুবই কঠিন। দুনিয়ার সবকিছুর সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। তাঁর ইচ্ছা মাফিক সবকিছু ঘটছে। যা কিছু ঘটছে তা মানুষের কল্যাণ আর মঙ্গলের জন্য হচ্ছে। সুতরাং সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা শোকর আদায় করা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্য বলে সূফিগণ মনে করে থাকেন (মুসলিম দর্শন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮)।

ইমাম গাজ্জালী (রহ) এর মতে, ঈমানই কৃতজ্ঞতার উৎস। সকল কল্যাণ আল্লাহর অসীম করুণা থেকে নিঃসৃত হয় (সূফি সাধনার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০)। তাঁর হৃদয়ে আল্লাহর প্রেমকেও তিনি আল্লাহর দান বলে মনে করেন। বাংলার মাটিতেও সূফিবাদের সুর অবিকৃত রয়েছে 'আমার এ প্রেম তোমার দান'। তুমি ধন্য ধন্য হে। সকল অবস্থায় পরম দয়ালু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকা সূফি সাধনার অতি প্রয়োজনীয় শর্ত।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (কাশফ) ঃ আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনার ক্ষেত্রে অতিন্দ্রিয় অনুভূতি উল্লেখযোগ্য বিষয়। অনুভূতিশীল জ্ঞান ছাড়া সাধকের সম্যক জ্ঞান উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কাশফ শব্দের সাধারণ অর্থ অন্তর্দৃষ্টি, উন্মোচন ইত্যাদি। সূফি সাধক ও তাসাওউফ পন্থীগণ শব্দটিকে আধ্যাত্মিক রহস্য অর্ন্তদৃষ্টি উন্মোচন অর্থে ব্যবহার করেন। সুফল বিচারে এটাকে তিনভাগে বিভাজন করা হয়েছে। যথা ঃ যুক্তিলব্ধ জ্ঞান (আকল) (২) শিক্ষালব্ধ জ্ঞান (ইলম) (৩) প্রত্যক্ষ (মুশাহাদা) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার (মারিফা) মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান (দার্শনিক প্রবন্ধাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৭)। সূফিদের মতে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই সাধক আল্লাহ সম্পর্কে বাস্তবজ্ঞান লাভ করতে পারে (সূফি সাধনার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০)। এ পর্যায়ে সূফি সাধক

পরমানন্দে নিজেকে বিস্মৃত হন, তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে তিনি অন্তর্লীন হয়ে থাকেন (দার্শনিক প্রবন্ধাবলি প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৭)। সূফি অভিজ্ঞতার এই নিবিড় মুহূর্তের নাম 'হাল'।

ভয় (খওফ) ঃ মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হলেও বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে দুর্বল হয়ে যায়। মানুষ এক দিকে সবল এবং আর একদিকে দুর্বল। আপন স্বার্থ বড় মনে করলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য করতে পারে না এমন কোন কর্ম নেই। তাই তিনি মানসিকভাবে দুর্বল। আর যার মধ্যে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা নামক পঞ্চশক্তি বিরাজমান তিনি সদা-সর্বদা সবল। মূলত সব সময় আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকা এবং মন্দ কাজ না করার জন্য দৃঢ় থাকাকে খওফ বলা হয়। কুরআনের একটি আয়াতে আছে, 'আর যাঁরা দান খয়রাত করেন এবং তাঁদের প্রভুর সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তনের ভয় রাখেন তাঁরাই ধর্মনিষ্ঠার দিকে দ্রুত এগিয়ে যান। তাঁরাই ধর্মনিষ্ঠা অর্জনে অগ্রগামী (২৩-আঃ ৬০-৬১)। আল্লাহর ভীতি সূফি সাধকের মনে আল্লাহর মহিমা ও অসীমতার ধারণা জাগিয়ে দেয়। তাঁর মনে আল্লাহর বিপুল শক্তি ও কৌশলের বিষয় জাগ্রত হয়, ঢলে পড়ে অর্থাৎ সে ধর্মনিষ্ঠ হয়ে ওঠে (সূফি সাধনার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১)। সাধারণ অর্থে পাপে লজ্জা, পাপে ভয় থাকা শ্রেয়। যাকে মানুষের নৈতিক এবং অধ্যাত্মিক উন্মেষের চাবিকাঠিও বলা যায়।

স্মরণ (জিকর) ঃ স্মরণ অর্থ সচেতন, জাগরণ, হুঁশ রেখে চলা ইত্যাদি। যাতে কোন রকমের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা না থাকে। স্মরণ শক্তি মানুষকে সম্যক পথে এগিয়ে দেয়। কোন কিছু পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির নামই জিকর। সূফিবাদে আল্লাহর নাম বার বার উচ্চারণ করাই হলো জিকর। জিকর দু'ভাবে করা যায়: (১) উচ্চ স্বরে এবং (২) নীরবে। উচ্চস্বরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করাকে বলা হয় 'জিকরে জলি' এবং নীরবে বা মনে মনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করাকে বলা হয়ে থাকে 'জিকরে খফী'। নিজ সত্তা বিস্মৃত হয়ে আল্লাহর আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য লাভ করা হলো জিকরের মূল ও উদ্দেশ্য। আল্লাহর ধ্যানে একাগ্রতাও অর্জিত হয়। জিকর করার জন্য পবিত্র কুরআনেও মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে। হে মুমিনগণ আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা কীর্তন কর (৩৩:৪১-৪২)। আরও বলা হয়েছে সকাল-সন্ধ্যা তোমার প্রতিপালক প্রভুকে মনে মনে বিনয় ও ভয়সহকারে স্মরণ কর (৭:২০৫)। নিজের অহমকে বিস্মৃত হয়ে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়াই জিকরের উদ্দেশ্য (সূফি সাধনার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০)। তখন সাধকের বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী এবং আধ্যাত্মিক অগ্রগতি সহজতর হয়। তাই জিকরের গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যবহ।

সত্যবাদিতা (সিদক্ব) ঃ সত্যবাদিতা সূফিদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুধু সূফিদর্শন কেন সত্যবাদিতা প্রতিটি মানুষের জন্য একটি মহৎগুণ। সূফিরা সত্যকে আঁকড়ে ধরে জীবন সাধনায় সাফল্য লাভে তৎপর। সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য পবিত্র কুরআনও মানুষকে আদেশ প্রদান করে (মুসলিম দর্শন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯)। নবী (দঃ) বলেন, তোমাদের সত্যবাদিতা রক্ষা করে চলা কর্তব্য। সত্যবাদিতা মানুষকে মঙ্গলের দিকে পরিচালনা করে এবং পুণ্য মানুষকে জান্নাতের দিকে ধাবিত করে (মুসলিম দর্শন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯)।

হাল ঃ 'হাল' কাশফের অব্যবহিত পূর্বাবস্থা। 'হাল' আল্লাহর অনুগ্রহ অসীম দয়ার উপর নির্ভরশীল। 'হাল' কে সূফির আধ্যাত্মিক জীবনের এক চরম প্রাপ্তি বলা হয়। সূফির ভাবানুভূতির বা আধ্যাত্মিক বা মানসিক এক বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় 'হাল'। 'হাল' সূফিমনের এমন এক ভিত্তি যার উপর হৃদয়ানুভূতি বা অন্তর্দৃষ্টি গড়ে ওঠে। এটা সূফি জীবনের সবচেয়ে নিবিড় অভিজ্ঞতা। যা ফানাফিল্লাহ অবস্থা লাভের জন্য এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ইলমে মারিফাত) ঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে জীবনসত্যকে উপলব্ধি করতে হয়। জাগতিক ও আত্যন্তিক দুঃখকে জয় করার একমাত্র সোপান হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আল্লাহর জ্ঞান নামে প্রতিভাত হয়। পরম সত্তার জ্ঞান অতিন্দ্রিয় অনুভূতি বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এই পরম তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করতে হলে ধ্যান, প্রেম পবিত্রতার সাহায্যে বুদ্ধি ও আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করতে হয়। কুরআন শরীফের মধ্যে সত্য জ্ঞানের তিনটি পথ প্রদর্শিত হয়েছে: (১) অনুমানলব্ধ জ্ঞান (২) প্রত্যক্ষণ জ্ঞান (৩) উপলব্ধিজাত জ্ঞান। দ্রষ্টব্য সূরা তাকাসুর (১০২)। সূফি যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে থাকেন তা এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। অনুমানলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সূফি বুদ্ধির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন-এই জ্ঞান বুদ্ধি নির্ভর। প্রত্যক্ষজাত জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি তন্ময়তা বা হাল অবস্থায় আধ্যাত্মিক গোপনীয় বিষয়

সমূহ অবগত হয়ে থাকেন। উপলব্ধিজাত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সূফি দরবেশ পরম সত্তার সঙ্গে মিলন অনুভব করেন (সূফি সাধনার ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১-৪২)।

দারিদ্র (ফকিরী) ঃ দারিদ্র বলতে এখানে অভাব অনটন ভোগকরাকে বোঝায় না। নিজেকে দরিদ্র চিন্তা করে একমাত্র মহান আল্লাহকে পরমদাতা, দুয়ালু ও ধনী মনে করে তাঁরই দয়া দাক্ষিণ্য কামনা করাকে বলা হয় ফকিরী। সর্বসাধারণের সহজবোধ্য করার মানসে সূফিরা দরিদ্রকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা: (১) এমন দরিদ্র ব্যক্তি যার কিছু নেই এবং তিনি কিছু চান না (২) এমন দরিদ্র ব্যক্তি যার কিছু নেই কিন্তু কেউ কিছু দিলে প্রত্যাখ্যান করেন না (৩) এমন দরিদ্র ব্যক্তি যার কিছু নেই কিন্তু আত্যন্তিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বন্ধু বান্ধবদের নিকট সাহায্য চেয়ে থাকেন (সূফি সাধনার ভূমিকা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৯)। কাশফ-আল-মাহজুব গ্রন্থে গুরুত্ব সহকারে – Plain living and high thinking আদর্শে ভগবান প্রেম ও আনুগত্যের অনুকুলে প্রচার করা হয়েছে দারিদ্রকে (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃঃ ৮৯, ২৫৬)।

ফানা ও বক্বা ঃ সূফি সাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে ফানা ও বক্বা। ফানা ও বক্বা এ দুটি সূফিবাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য শব্দ। ফানার অর্থ হচ্ছে বিলুপ্তি বা ধ্বংস প্রাপ্তি। মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছাতে বিলুপ্তকরণের অর্থ হচ্ছে ফানা (দার্শনিক প্রবন্ধাবলি, বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৭-২৩৮)। আরো সহজভাবে ফানা বলতে বোঝানো হয়েছে-তন্ময়তার মাধ্যমে আত্মসচেতনতা মুছে ফেলে ঐশী চেতনায় উন্নীত হওয়া। এ স্তরে সূফিসাধকগণ জাগতিক কামনা বাসনা ত্যাগ করে ঐশী সত্তায় পরিণত হন এবং নিজেদেরকে সর্বতোভাবে কামনা বাসনা ত্যাগ করে ঐশী সত্তায় পরিণত হন এবং নিজেদেরকে সর্বতোভাবে সমাহিত করেন আল্লাহর প্রেম ও ধ্যানে (মুসলিম দর্শন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯)। মরমীবাদ অনুসারে মানুষের আমিত্ববোধ যতগুলো মানবীয় গুণ (সিফাত) সমন্বয়ে গঠিত, সেই সিফাতগুলোর বিলোপ সাধন করে সূফি কেবল আল্লাহর মাধ্যমে এবং আল্লাহতে পরমধন্য হতে পারেন (দার্শনিক প্রবন্ধাবলি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৮)। এই ফানা লাভ করতে ৪টি স্তর পার হতে হয়। যথা: (১) ফানা ফিন্নাফস বা ফানা ফিল ওজুদ (২) ফানা ফিশশায়েখ (৩) ফানা ফির রাসুল এবং (৪) ফানাফিল্লাহ। চতুর্থ স্তর ফানাফিল্লাহ অবস্থায় যখন সূফি সাধক স্বীয় অস্তিত্ববোধ হারিয়ে ফেলেন এবং যখন আপনার বলে কিছুই থাকেনা তখন স্বয়ং আল্লাহই বিরাজ করেন। যেমন একটি পাত্রে যখন পানি থাকে তখন সেখানে বায়ু থাকে না। কিন্তু পাত্রে পানি না থাকলে বায়ুতে সে পাত্র পূর্ণ থাকে। তেমনি আত্মার পাশবিক প্রবৃত্তি, মানবিক গুণাবলী ও অস্তিত্ববোধ দূরীভূত হলে সেখানে আল্লাহর ফিতরাত (প্রকৃতি ও স্বভাব) ও তাঁর অস্তিত্বের অনুরূপ অনুপ্রবেশ করে।

বক্বা ঃ ঐশী সত্তায় স্থায়িত্ব লাভ করাকে বলা হয় বক্বা। ফানা স্তরের পরই সূচিত হয় বক্বা। বক্বাবিল্লাহ অবস্থায় সাধক ঐশী গুণে গুণান্বিত হন। তাঁর সকল ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছায় লয় পায় (সূফি সাধনার ভূমিকা প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২)। সে জন্যই ফানা ফিল্লাহর স্তর নঞর্থক (Negative); পক্ষান্তরে বক্বা বিল্লাহ সদর্থক (Positive)। ফানা ফিল্লাহ হতে আত্ম চেতনার ধ্বংস, আর বক্বা বিল্লাহ হতে পূর্ণ জীবন লাভ হয়। অর্থাৎ যখন আমার আমিত্ব থাকবে না তখনই আল্লাহ প্রাপ্তি ঘটবে। এ স্তরে সূফির আত্মসত্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না, বরং স্থায়িত্ব লাভ করে আল্লাহর চেতনায়। কিন্তু বক্বাবিল্লাহ লাভ করলে আমিত্বের ভাব আর থাকে না। এখানে যাতের মধ্যে সিফাত মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

সুতরাং এই স্তরে সূফি সাধক আল্লাহর চিরন্তন, শাশ্বত ও অসীম সত্তায় স্থায়ীভাবে স্থিতি লাভ করেন। সাধক এ স্তরে কুতুব, গাউস আরিফবিল্লাহ প্রভৃতি মর্যাদায় ভূষিত হন। এ স্তরে অমরতা লাভ করে সাধক চিরঞ্জীব হন (বাংলাদেশের সূফি দর্শনের রূপরেখা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১)।

তাই সূফি বলেন, "আত্মবিস্মৃত হয়ে সবাইকে প্রীতি দান কর, আর পরের কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ কর। মানুষের হৃদয় জয় করাই সবচেয়ে বড় হজ্ব। একটি হৃদয় সহস্র কা'বার চেয়েও বেশি, কেননা কা'বা আজর পুত্র ইব্রাহিমের তৈরী একটি ঘরমাত্র আর মানুষের হৃদয় হচ্ছে আল্লাহর আবাস। সূফিদের ভাববাদে বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদের প্রভাব থাকলেও বৌদ্ধ নির্বাণবাদও ফানাতত্ত্বের উন্মেষে সহায়ক হয়েছে সে সঙ্গে গুরুবাদও (জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য; সুনীতি কুমার চট্টোপধ্যায়, কলি. ১৯৮৭, পৃঃ৪১)।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও অন্যায় ও অবৈধ কাজ ও মন্দ অভ্যাস ও দোষাবহ চিন্তা ভাবনা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যথা (১) কামুকতা (শাহওয়াত) (২) মিথ্যা (মিথ্যা বলা ও মিথ্যার মধ্যে যাওয়া) (৩) অবৈধ

(হারাম) (৪) কিনা (মনের দ্বেষ) (৫) হিংসা (হাসাদ) (৬) লোভ-লালসা (হারস) (৭) অহংকার (তাকাব্বরি) ও খোদপছন্দী জন (৮) পরনিন্দা (গীবত) (৯) লোক দেখানো ইবাদত (রিয়া) (১০) দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা (হুব্বে দুনিয়া) (১১) কৃপণতা (বখিলি) এবং ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল মনে করা (গুরুর)।

এতদ্ব্যতীত আরও ১২টি গুণ অর্জন করার প্রতিও সূফি দরবেশগণ জোর দিয়ে থাকেন। যথা: (১) মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা (তাকওয়া) (২) বেহুদা কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকা (অরা) (৩) আল্লাহর দানে তুষ্ট থাকা (কানায়ত) (৪) দৃঢ় বিশ্বাস (একিন) (৫) আল্লাহকে স্মরণ ও চিন্তা করা (যিকির ও ফিকির) (৬) সত্যের উপরে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকা (ইস্তেকামাত) (৭) লজ্জা (হায়া) (৮) আল্লাহর নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সৌজন্য ব্যবহার (আদব) জ্ঞান অর্জন (ইলম) (৯) আল্লাহর দাসত্ব ও তদ্রুপ মনোভাব সৃষ্টি (আবুদিয়াত) (১০) স্বার্থপরতা ত্যাগ করে অন্য ভাইয়ের উপকার করার মানসিকতা এবং (১১) আল্লাহর দর্শন এবং (১২) ধ্যানজনিত সত্যোপলব্ধি (মোশাহেদা) (সূফিদর্শন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯-১৪১)।

এ সমস্ত দোষত্রুটি পরিবর্জন ও সদগুণাবলির মাধ্যমে একজন মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে আধ্যাত্মিকভাবে অগ্রগতি লাভ করতে পারে। নৈতিক চরিত্রে উন্নতি না হলে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাই নৈতিক মূল্যবোধের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সূফি পীরগণ আত্মিক বিশুদ্ধতা, চিত্তের স্থিরতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁদের মুরীদদেরকে বিভিন্ন প্রকারের জপতপ (ওযীফা) করার নির্দেশ দেন এবং তরীকায় বিভিন্ন প্রকার জিকির করার উপরও জোর দেন। জিকিরে দিলের ময়লা পরিষ্কার হয়ে আয়না সদৃশ উজ্জ্বলতা ধারণ করে, যাতে আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়। তদুপরি তরীকতের মৌলিক উদ্দেশ্য ধ্বংসাত্মক ও মন্দ রিপুগুলো দূর করা এবং তৎপরিবর্তে আল্লাহর চরিত্র ও স্বভাব লাভ করলে এক অতি নতুন ভাবের নতুন মনের ও নতুন শরীরের উদয় হয়। মানুষ তখনই অভিনবত্ব ও প্রকৃত মানবতা লাভ করে। মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়। বৌদ্ধিক চেতনা, মুক্ত মন, ত্যাগ, সংযম নির্লিপ্ত-নিরাসক্ত ধ্যান-সাধনা মানুষের জাগতিক ও আত্যন্তিক দুঃখ থেকে মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে। এখানেই শান্তি।

সকলের মধ্যে নৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটুক।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম-২য় খণ্ড, এম. এ সোবহান পরিচালক ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭।

২. মুসলিম দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ড. মোঃ বদিউর রহমান, ঢাকা-২০০৫।

৩. দার্শনিক প্রবন্ধাবলি, বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব, মোঃ আবদুল হালিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ২০০৩।

৪.সূফিদর্শন, চৌধুরী শামসুর রহমান, ঢাকা-২০০২।

৫. সূফিদর্শন, ড. ফকীর আবদুর রশিদ, ঢাকা-১৯৮০।

৬. সূফি সাধনার ভূমিকা, ড. রশীদুল আলম, ঢাকা-১৯৮৬।

৭. বাংলাদেশে সূফিদর্শনের রূপরেখা, লাভলী আক্তার ডলি, ঢাকা-২০০১।

৮. ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কলি-১৯৭৭।

৯. বাঙলার সূফি সাহিত্য, আহমদ শরীফ, ঢাকা-২০০৩।

১০. মুসলিম দর্শন পরিচিতি, ড. মোঃ আবদুল হামিদ, ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, ঢাকা-২০০১।

১১. বাঙালীর দর্শন, মোঃ অহিদুল আলম, নোয়াখালী-
২০০৫।

১২. দর্শন-দিকদর্শন-১ম খণ্ড, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, চিরায়ত প্রকাশন, কলি-১৯৮৬।

১৩. উদ্বোধন, শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সংকলন, সম্পাদক-স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, কলি-১৯৯৯।

১৪. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন।

১৫. জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য, সুনীতি কুমার চট্টোপধ্যায়, কলি-১৯৮৭।

মহান সূফিসাধক হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি বশ্‌ক আলী শাহ্ মাইজভাণ্ডারী (র.)

● প্রফেসর শাহজাদা সৈয়দ সফিউল গনি চৌধুরী ●

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনুল মাজিদে ইরশাদ করেন, "আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহে লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্ জানুন (সূরা ইউনুস আ-৬৩)" অর্থাৎ সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। 'নিশ্চিন্ত' এবং 'নেয়ামত প্রাপ্ত' আল্লাহর বন্ধুগণের অন্যতম বন্ধু হলেন মাইজভাণ্ডারী তরিকার মহান দরবেশ- ফকির হযরত শাহ্ সুফি বশ্‌ক আলী শাহ্ (র.) তিনি ১৮৪২ মতান্তরে ১৮৪৩ সনের ১০ ভাদ্র রোজ সোমবার সুবেহ সাদেকের সময় কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার অন্তর্গত পায়ব গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি মোঃ উজির মাহামুদ চিশতী এবং মাতার নাম মোছাঃ মেহেরুন নেছা ফুল জান। তিনি মা-বাবার ঔরসজাত একমাত্র সন্তান ছিলেন।

তিনি সব সময় একা থাকতে পছন্দ করতেন এবং কথাবার্তা কম বলতেন। কথাবার্তা যখন বলতেন তখন সবাই মুগ্ধ হয়ে কথা শুনার জন্য অপেক্ষা করতেন। দেহের গঠন ছিল গোলাকার, তাঁর গায়ের রং ফর্সা ছিল, তিনি ছিলেন অনেক লম্বা, কানের গোড়ালী পর্যন্ত তাঁর মাথার চুল ছিল। তিনি আধ্যাত্মিক গান বাজনা পছন্দ করতেন। তিনি ভক্তগণকে নিয়ে গান বাজনা করতেন, গানের কলিগুলো ছিল নিরুপ,

মন ফকিরের দরজা খোল বিসমিল্লাহ,
কলমা তৈয়ব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
কালো কালির আয়না দিয়ে মুখ দেখা যায়না,
হিংসা ভরা হৃদয় নিয়ে খোদা পাওয়া যায়না

তিনি আরো বলতেন

পায়বেতে উদয় হল সোনার চাঁন মনি
আয়নার মত মুখ চাহিলে দেখবিরে ছবি
বীর্য্য পুত্র ত্যাগ্য করি, শিষ্য পুত্র লাইয়া ঘুরি।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরী আমার বাবা মাওলানা।

তিনি সদা সর্বদা অধিক পরিমানে আল্লাহ পাকের যিকির করতেন। তিনি মা বাবার নিকট ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হন। তিনি যে বাড়িটিতে বাস করতেন সে বাড়িটি ছিল গাছ গাছালি তরুলতায় ঘেরা। বাড়িটি ছিল খুবই নির্জন প্রকৃতির, দিনের বেলায়ও ওই বাড়িটিতে মানুষ যেতে ভয় পেত। বাড়িটির সাথে অন্য কোন বাড়ির সংযোগ ছিলনা। বাড়িটিতে এতই গাছ ছিল যেন মনে হত একটি বনের মধ্যে হযরত বশ্‌ক আলী শাহ্ বাস করছেন। তিনি পশু পাখি জীব জন্তুকে অনেক ভালবাসতেন। ছোটবেলায় তিনি মাঠে ছাগল চড়াতেন। সাথে একটি লাঠি ও এক লোটা পানি নিয়ে যেতেন। যখন নামায এর সময় হত তখন অযু করে নামায আদায় করতেন। মাথায় সবসময় একটি গামছা বেঁধে রাখতেন।

এমনিভাবে দীর্ঘদিন কাটানোর পর তাঁর বন্ধু ঢাকা জেলার জিটকা নিবাসী জনাব বশির উদ্দিন খন্দকারের সাথে পবিত্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে হযরত গাউসুল আ'যম মাওলানা শাহ্‌সূফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র নিকট তিনি তাসাউফ জ্ঞান অর্জন করার জন্য যান। হযরত গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী কেবলার সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকার পর হযরত শাহ্ কেবলা তাঁকে হযরত গাউসুল আ'যম বিল বিরাসত বাবাভাণ্ডারীর খেদমতে পাঠান এবং হযরত বাবাভাণ্ডারী (ক.)'র নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। হযরত বশ্‌ক আলী শাহ্ বাবা ভাণ্ডারীকে মনে মনে প্রশ্ন করেন মহব্বত কি? তখন বাবা ভাণ্ডারী জালালিয়ত হালতে বলে উঠলেন সবচেয়ে উত্তম চুপ, এ বাণী (কালাম) শ্রবণ করার পর তিনি জবান বন্ধ করে দিলেন। এ দিনটি ছিল চৈত্র মাসের এক তারিখ। তার জীবদ্দশায় এ দিনটি তিনি মিলাদ মাহফিল, জিকির আজকার করে পালন করতেন। এমতাবস্থায় একটানা ১৮ বছর কোন কথা বলেননি।

তাঁর জবান বন্ধ থাকা অবস্থায় সাধারণ লোকে তাকে শারীরিক নির্যাতন করতে আরম্ভ করলেন। মুরাদনগর থানার পায়ব গ্রামের সুজাত আলী ফকির বর্ণনা করেন হযরত বশ্‌ক আলী শাহ্ (র.)'র গ্রামের বাড়ির নিকট একটি নৌকা মেরামত করা হচ্ছিল এবং সেখান দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। আছমত আলী নামে এক লোক তাঁকে ডেকে বললো তোমার ভাণ্ডারীবাবা বলেছে এই লোহার গজালিটা তোমার পায়ে মারতে, এই কথা বলে গজালিটা তাঁর পায়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি একটু আহঁ! ওহঁ! শব্দ ও করলেন না। পরে অন্য লোক এসে গজালিটা তাঁর পা থেকে রশি লাগিয়ে টেনে বের করেন।

দেবিদ্বার থানার জয়পুর নিবাসী মোঃ মোশতাক আলী মাষ্টার সাহেব বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর মামা ও ভক্ত বাড়ি

দেবিদ্বার থানার জয়পুর গ্রামে যাচ্ছিলেন। সেখানে কতগুলো লোক জমিতে কাজ করছিল। এক ব্যক্তি তাঁকে ডাকলেন, ভাণ্ডারী এদিকে এসো। তিনি তাদের কাছে গেলেন। যাওয়ার পর তারা বললেন, আজ ফকিরকে পরীক্ষা করব। তখন তারা তামাক খাওয়ার কতগুলো টিক্কা জ্বালিয়ে তাঁর মাথায় দিলেন। এবং বাতাস করতে থাকেন, তাতে জ্বালানো টিক্কা গুলো তাঁর মাথার উপর জ্বলে ছাই হয়ে গেল। তাঁর মাথার একটি চুলও পুড়ল না। তিনি কোন জ্বালাও অনুভব করলেন না। ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি মানুষের ভক্তি ও মহব্বত বাড়তে লাগলো। উপস্থিত সকলে তাঁর আশেক হয়ে যান।

দেবিদ্বার থানার উজানিজোড়া গ্রাম নিবাসী জনাব হাফিজ উদ্দিন খন্দকার, দাউদকান্দি থানার চারিপাড়া গ্রাম নিবাসী জনাব আক্কাস আলী হাজী, মুরাদনগর থানার খৈয়ারা গ্রামের নিবাসী জনাব জুনাব আলী ভূইয়া প্রমুখ বলেন, একদিন রাতে হযরত বশ্‌ক আলী শাহ্ নিজ বাড়ীতে ভক্তবৃন্দ নিয়ে ঘরে বসে আছেন। হঠাৎ ঘরের মুলি বাঁশের ভেতর হতে একটি বিষধর সাপ তাদের মাঝে পড়ল, সবাই হুড়াহুড়ি করে এদিক সেদিক চলে গেল কিন্তু হযরত বশ্‌ক আলী চাদরমুরি অবস্থায় বসা ছিলেন। সাপটি তাঁর চাদরের নিচে চলে গেল এবং তাঁর পায়ে ছোবল মারল, সাথে সাথে সাপটি মরে সাদা হয়ে গেল। কিন্তু তিনি কোন ব্যথা পাননি।

মুরাদনরগ থানা মোগশাইড় গ্রামের চেরাগ আলীর স্ত্রী বলেন, আমার স্বামী আমার আগে আরো একটি শাদী করেন কিন্তু দীর্ঘ ১৫ বছর ঘর সংসার করার পরও তার কোন সন্তান হয়নি। পরে আমাকে শাদী করেন, আমার শাদীর ৯ বছর পরও কোন সন্তান আমার গর্ভে আসেনি। আমি আমার স্বামীর দুলাভাইয়ের বাড়ীতে যাই। ঐদিন হযরত শাহ্ সূফী মাওলানা বশ্‌ক আলী শাহ্ দুলাভাইয়ের ঘরে মাহফিলে এসেছিলেন এবং মাহফিল শেষে ভাত খাচ্ছিলেন। দুলাভাই হুজুরকে বললেন, হুজুর আমার শ্যালকের ঘরে কোন সন্তান হচ্ছেনা। ইনি আমার শ্যালকের স্ত্রী, আপনি একটু তার জন্য দোয়া করেন। এ কথা বলার পর হুজুর তার দিকে তাকালেন, উনার পিট ঘেঁষে থাকা বিড়ালছানাটি মহিলার দিকে ছুঁড়ে দেন এবং মহিলা বিড়াল ছানাটি কোলে করে নিয়ে যান। চেরাগ আলীর স্ত্রী বলেন, ঠিক ঐ মাসেই আমি গর্ভবতী হই। বর্তমানে আমার তিন ছেলে দুই মেয়ে। হযরত বশ্‌ক আলীর উছিলায় আল্লাহপাক আমাকে সন্তান দান করেছেন। পরবর্তীতে তাদের পরিবরের সবাই তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করে ধন্য হন।

ব্রাহ্মণ পাড়া থানাধীন নাল্লা গ্রামের আব্দুল করিম মুন্সি বর্ননা করেন, আমার বাড়িতে হযরত মাওলানা বশ্‌ক আলী শাহ্‌কে দাওয়াত করেছিলাম। তখন তাঁর যবান বন্ধ ছিল। তিনি আট থেকে নয় জন ভক্ত নিয়ে আমার বাড়িতে নৌকা যোগে আসেন। বাড়ির ঘাটে আসা মাত্র মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। আমরা সবাই তাড়াতাড়ি করে ঘরে চলে যাই। তখন হযরত বশ্‌ক আলী শাহ্ এর কথা আমাদের মনে ছিলনা। সবাই সবার মত করে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে আশ্রয় নিই। প্রায় চার থেকে পাঁচ ঘন্টা যাবত প্রবল বেগে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির পর মনে পড়ে হযরত বশ্‌ক আলী শাহ্ এর কথা। তখন আমরা সবাই তাঁকে খোঁজার জন্য বের হই ভিন্ন ভিন্ন ঘরে। কিন্তু তাঁকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর খোঁজার জন্য যাই নৌকা ঘাটে, সেখানে গিয়ে দেখি নৌকা পানিতে ডুবে গেছে। কিন্তু হযরত বশ্‌ক আলী শাহ্ পানির উপর বসে আছেন। তিনি পানিতে ডুবেন নি এবং পানির উপর দিয়ে হেটে আমার বাড়িতে চলে আসেন। এক ফোটা পানিও তাঁর উপর পড়েনি। এর ফলে তাঁর প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা অনেক বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং অনেক লোক মুরিদ হন।

দেবিদ্বার থানায় উজানিজোড়া গ্রামের নিবাসী মোঃ হাফিজ উদ্দিন খন্দকারের ছেলে মোঃ আব্দুল মজিদ খন্দকার বলেন, আমার বাড়ির পুকুর পাড়ে ২০ থেকে ৩০টি আম গাছ হযরত বশ্‌ক আলী শাহ্ নিজ হাতে লাগিয়েছিলেন। গাছ লাগানোর ১০ বছর পর হযরত বশ্‌ক আলী শাহ্ যখন আমার বাড়িতে মাহফিলের দাওয়াতে আসেন তখন বললাম, হুজুর আমার আম গাছগুলোতে কোন আম ধরে না। তখন হযরত বশ্‌ক আলী শাহ্ বললেন জাভার ভর্তি চাউল থাকলে, পুকুর ভরা মাছ থাকলে, গোয়াল ঘরে গাভী থাকলে আমের কী প্রয়োজন? বর্তমানে আম গাছ গুলো আছে কিন্তু এখনও গাছগুলোর মধ্যে কোন আম ধরে না। এভাবে তাঁর মহিমা বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেতে থাকে সব মানুষের কাছে।

দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত চারিপাড়া গ্রামের নিবাসী মোঃ কাশেম আলী সরকার বলেন, আমি বিয়ে করেছি ১০ বছর হয়েছে কিন্তু এখনও আল্লাহপাক আমাকে কোন সন্তান দান করেননি। আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ি। একদিন আমার স্ত্রী স্বপ্নে দেখেন, হযরত মাওলানা বশ্‌ক আলী শাহ্ কে। হযরত বশ্‌ক আলী শাহ্ (র.) স্বপ্নযোগে বলেন, আমাকে তোমার কোলে তুলে নাও। তারপর তিনি হযরত বশ্‌ক আলী (র.) কে কোলে নিলেন। ঐদিন এর পর থেকে আমি (মোঃ কাশেম আলী সরকার এর স্ত্রী) গর্ভবতী হই। হযরত

বশৃক আলী শাহ্ (র.) উছিলায় আল্লাহপাক আমাকে দুই সন্তান দান করেছেন। এখন আমি দুই সন্তান এর মা। এখনও তারা জীবিত আছেন।

দেবিদ্বার থানার জয়পুর গ্রামের নিবাসী হাজ্বী কালা গাজী খাঁন বর্ণনা করেন, আমার ছেলে চট্টগ্রাম বন্দরে ফুড অফিসে চাকরি করে। সে অফিসে দীর্ঘদিন চাকরি করার পর সেখানে হঠাৎ করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মালামাল এবং কাগজ পত্র চুরি হয়ে যায়। অফিস কর্তৃপক্ষ আমার ছেলে সহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে। তখন আমি অনেক উকিল এর কাছে দৌড়াদৌড়ি করি। উকিল বলেন, আপনার ছেলের জেল অনিবার্য। তখন আমার মন অনেক খারাপ হয়ে যায়। এ ব্যাপারটা আমার প্রতিবেশী জনাব মোঃ মোশকত আলী মাষ্টার সাহেব এর সাথে আলাপ করি। মাষ্টার সাহেব আমাকে পরামর্শ দেন তার পীর হযরত বশৃক আলী শাহ্ (র.)'র নিকট যাওয়ার জন্য । আমি মাষ্টার সাহেবকে নিয়ে হযরত বশৃক আলী এর নিকট যাই এবং আমি আমার আরজি পেশ করে বলি আমার ছেলের জন্য দোয়া চাই। তখন হুজুর বললেন, তোমার ছেলের প্রমোশন হবে। আমরা উপস্থিত সকলে হতভাক হয়ে চলে আসি। কিছুদিন পর আমার ছেলে মামলা থেকে নিরপরাধ হিসেবে রায় পায় এবং তার প্রমোশন হয়। আমি আমার পরিবারের সকলকে নিয়ে হযরত বশৃক আলী কেবলার নিকট যাই এবং বায়াত গ্রহণ করি।

মুরাদনগর থানার ধৈয়ারা গ্রাম নিবাসী জনাব জুনাব আলী ভূঁইয়া বর্ণনা করেন, আমার পীরসাহেব হুজুর আমার বাড়ীতে মাহফিলের দাওয়াতে আসেন। তখন আমার গ্রামের মসজিদ এর ইমাম সাহেব ও আরো কিছু লোক আমার বাড়িতে উপস্থিত হন এবং বলেন তোমাদের এই মাহফিল করা যাবে না। তোমার হুজুরের সাথে বাহাস হবে। তখন বশৃক আলী কেবলা সবাইকে ডেকে বললেন আমি আপনাদের সাথে বাহাস করার জন্য প্রস্তুত আছি কিন্তু আমাকে ও ইমাম সাহেবকে দুইটি বস্তায় ঢুকিয়ে মসজিদ এর সামনের পুকুরে ফেলে রাখবেন। সাত দিন পরে দুই জনকে উঠানোর পর বাহাস হবে। একথা শোনার পর তারা সকলে চলে গেলেন। তারপর দিন সকালে ৮-৯ জন লোক আসেন এবং বলেন আমরা বাহাস করতে রাজি আছি। তখন একটি বস্তার ভেতরে হযরত বশৃক আলী শাহ্ কেবলাকে ঢুকতে বললে তিনি বস্তার ভেতরে ঢুকে পড়েন। অন্য বস্তার মধ্যে ইমাম সাহেবকে না ঢুকিয়ে খালি রেখে দেন। উনারা বেশি সংখ্যক লোক হওয়ার কারনে ভূঁইয়া সাহেব কিছুই বলতে পারেননি। সবাই হযরত বশৃক আলী শাহ্ কেবলাকে নিয়ে পুকুরের দিকে চলে যান এবং বস্তা বন্দী অবস্থায় পুকুরের মধ্যে ফেলে দেন। আছরের নামাজ এর কিছু সময় আগে তারা হযরত বশৃক আলী কেবলাকে পুকুর থেকে উঠানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং সকলে বলতে থাকেন তিনি মরে গেছেন তাড়াতাড়ি মাটি দেয়ার ব্যবস্থা করা না হলে কোর্টকাচারী হবে। তখন কয়েকজন লোক তাঁকে পানি থেকে উঠিয়ে বস্তা খুলে দেখেন তাঁর শরীরের কাপড় একটু ও পানিতে ভিজেনি এবং তিনি মারাও যাননি। উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে যান এবং সকলে তাঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন।

দেবিদ্বার থানার জয়পুর গ্রাম নিবাসী জনাব নোয়াব উদ্দিন ফকির বর্ণনা করেন, আমি হযরত মওলানা বশৃক আলী শাহ্কে দেখার জন্য দাউদকান্দি থানার চারিপড়া গ্রামের জনাব আব্বাস আলীর বাড়িতে যাই। তার অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা। উপস্থিত মেহমানদের জন্য এক কেজি এক পোয়া চাউল কিনে আনেন এবং তা রান্না করেন। উপস্থিত মেহমানের সংখ্যা ছিল মোট ৪০ জন। ভাত রান্না করার পর হুজুর শোভার মা নামে একজন মহিলা খাদেমকে ডেকে সবার মধ্যে ভাত বন্টন করে দেওয়ার জন্য বলেন। তিনি ইতস্তত: করতে লাগলেন। কিভাবে এক কেজি এক পোয়া চাউলের ভাত ৪০ জন মানুষকে বন্টন করে দেবেন। হুজুর আবার হুকুম করলেন ভাত বন্টন করে দেয়ার জন্য। তারপর তিনি সবার মাঝে ভাত বন্টন করে দেন, তারা সবাই তৃপ্তিভরে ভাত খেয়েছিলেন।

দেবিদ্বার থানার উজানিজোড়া গ্রাম নিবাসী জনাব হাফিজ উদ্দিন খন্দকারের ছেলে জনাব গফুর উদ্দিন খন্দকার বর্ণনা করেন, আমার মুর্শিদ আমাকে ডেকে বললেন, লাউ দিয়ে শোল মাছ রান্না করে খেতে অনেক ভাল লাগে। তখন আমি আমাদের বাড়ীর আশেপাশে যত জলাশয় আছে জাল নিয়ে শোল মাছ ধরার জন্য বের হই। সারাদিন মাছ ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কোন মাছ পেলাম না। অবশেষে বাড়ী ফিরে আসলাম মন খারাপ করে। মনে মনে বলতে লাগলাম মুর্শিদকে আমি শোল মাছ খাওয়াতে পারবনা। আমি বাড়ির মধ্যে একটি নতুন পুকুর খনন করেছিলাম। পুকুরটির মধ্যে অল্প বৃষ্টির পানি আছে। আমি আমার জালটি ধোয়ার জন্য পানিতে ছুঁড়ে মারলাম। জালটি পানি থেকে যখন টেনে আনলাম দেখি জালটির মধ্যে দুইটি বড় শোল মাছ। আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে বলতেছিলাম নতুন পুকুর, তেমন পানিও নেই, মাছ আসল কোথায় থেকে? মুর্শিদ কেবলাকে মাছগুলো দেখালাম, দেখানোর পর মুর্শিদ কেবলা

মিটমিট করে হাসতে ছিলেন। এভাবে মায়াবী মধুর হাসিতে আমাদের সকলের মন কেড়ে নিলেন। তারপর বললাম, মুর্শিদ কি খেলা তুমি শুরু করছ! তোমার খেলা বুঝার মত আমাদের জ্ঞান দাও।

মুরাদনগর থানার পরমতলা গ্রামের নিবাসী জনাব চাঁন খাঁন সাহেব বর্ণনা করেন, আমি ৯ টাকা দিয়ে একটি গাভী কিনেছিলাম। কিন্তু গাভী থেকে কোন দুধ দোহন করতে পারছিলাম না। একদিন আমার পীর সাহেব হুজুর কেবলাকে আমার বাড়ীতে মিলাদ এর জন্য দাওয়াত করি। হুজুর কেবলা ১০-১৫ জন ভক্ত ও আশেকান নিয়ে আমার বাড়ীতে মিলাদে আসেন। তখন আমি মনে মনে আরজু করি এ গাভীটির দুধ দিয়ে চা ও ফিন্নি রান্নাকরব। হুজুর কেবলার অনুমতি নিয়ে আমি আমার গাভীটির দুধ দোহন করতে যাই। তখন গাভীটি দোহন করতে কোন রকম সমস্যা করেনি। হঠাৎ হুজুর কেবলা ঘর থেকে বললেন, আর দোহন করা দরকার নেই। তখন আমি মেপে দেখি সাত কেজি দুধ হয়েছে। এই গাভীটি আমার নিকট ৬ বছর ছিল। কখনও ৭ কেজির কম ও বেশি দুধ দোহন করতে পারিনি।

মুরাদনগর থানার পরমতলা নিবাসী আওয়ালী সরদার বাড়ীর জনাব আকমত আলী ফকির বর্ণনা করেন, আমার মুর্শিদ কেবলা আমার বাড়ীতে মাহফিলের দাওয়াতে আসেন। তখন ঘরে প্রায় ৭০-৮০ জন ভক্ত ও আশেকান ছিলেন। মাসটি ছিল আশ্বিন, মশার খুব উপদ্রবও ছিল। মশার কামড়ে সবাই অতিষ্ঠ হচ্ছিল, মাহফিলে কেউই মনোনিবেশ করতে পারছিলনা। তখন মাহফিল থেকে হঠাৎ করে একজন উঠে বললেন, হুজুর অনেক মশা কামড়াচ্ছে। হযরত বশক আলী শাহ্ (র.) আকমত আলী ফকিরকে ডেকে বললেন, তোমার বাড়ীতে মাছ ধরার চুয়া অথবা চাঁই আছে? আকমত আলী ফকির বলল, জি হুজুর আছে। হযরত বশক আলী বলল নিয়ে এসে তোমার ঘরের দরজার বাইরে রাখ। রাখার কিছুক্ষণের মধ্যে সব মশা চাইয়ের ভেতর চলে যায়। তখন শান্তিপূর্ণ ভাবে মিলাদ মাহফিল সম্পন্ন করেন। আজ পর্যন্ত তার বাড়ীতে কোন মশা নেই।

দাউদকান্দি জেলার চারিপাড়া গ্রামের জনাব আক্কাস আলী হাজ্বী বর্ণনা করেন, মওলানা বশক আলী শাহ্ আমার বাড়ীতে মাহফিলের দাওয়াতে আসেন। আমার বাড়ী এবং আশেপাশের বাড়ীর লোকজন সবাই পানি পড়ার জন্য আসেন। সবাইকে হুজুর পানি পড়া দেন। সবাই বিদায় হওয়ার কিছুক্ষণ পর আরেকজন লোক আসেন, তখন হুজুর খাটে শুয়ে আছেন। তখন আমি হুজুরকে বললাম, হুজুর একটি লোক পানি পড়ার জন্য এসেছে। হুজুর বললেন, জানালার দিকে আসতে বল, আমি তাকে জানালার দিকে নিয়ে যাই। তখন হুজুর ঘরের ভিতর থেকে ফুঁ দিলেন, তারপর তিনি পানি নিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার পথে পড়ানো পানিতে তার বিশ্বাস হলনা, সেজন্য পড়ানো পানিটা সে খালের মধ্যে ফেলে দিল। সাথে সাথে খালের পানিতে আগুন লেগে যায়। তখন দৌড়ে আমার নিকট আসে, আমরা সকলে গিয়ে দেখি ঠিকই পানিতে আগুন জ্বলছে। আমরা হুজুরের নিকট এসে বলি, তার ভুল হয়ে গেছে, মাফ করে দেন। হুজুর বলেন, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু অবিশ্বাসে বহুদুর"। তারপর হুজুর আবার পানি পাড়া দিলেন, তখন পড়ানো পানিটা আবার পানিতে ঢেলে দেই, সাথে সাথে আগুন নিভে যায়। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে পাড়া প্রতিবেশি সকলে তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে।

দেবিদ্বার থানায় শিরাউকান্দি গ্রাম নিবাসী জনাব আশ্রাফ আলী বর্ণনা করেন, আমাদের গ্রামের মধ্যে হাতাবের একটি সাঁকো ছিল। সাঁকোটি প্রায় ২০-৩০ হাত উচু ছিল। সাঁকোটির কাছে কিছু দুষ্ট লোক দাঁড়িয়ে ছিল। লোকগুলো হযরত বশক আলী শাহ্কে ডেকে বললেন, সাঁকোটির উপরে উঠতে। তিনি তাদের কথামত সাঁকোতে উঠলেন। তারা সাঁকোটি থেকে হযরত বশক আলী শাহ্ কে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন এবং তাঁর দুটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তিনি কোন আহ্! ওহ্! শব্দ করলেন না। তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি, কোন অভিশাপও দেননি। এভাবে অত্যাচর নির্যাতনে হযরত বশক আলী শাহ্ (র.)'র সারাটি জীবন অতিবাহিত হয়।

ঐ গ্রামে জনাব জিয়া গাজী নামে এক ভদ্র লোক ছিলেন, তিনি হযরত বশক আলী শাহ্ এর ভক্ত ছিলেন। তিনি হযরত বশক আলী শাহ্ এর কাছে আরজু করলেন, হুজুর আমি হজ্বে যাব। আমার জন্য দোয়া করবেন। বশক আলী শাহ্ (র.) হঠাৎ করে বলে উঠলেন, কানা তুই কি আমাকে দেখিস না? তিনদিন পর জিয়া গাজী বাড়িতে এসে চৌকির উপর উঠে কাজ করছিলেন। হঠাৎ করে চৌকির তক্তা খুলে গিয়ে তার চোখের মধ্যে আঘাত পায়। কাঠের তক্তার মধ্যে তারকাঁটা ছিল। তারকাঁটার আঘাতে তার দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়, তার আর হজ্বে যাওয়া হলো না।

পায়ব গ্রামের জনাব আনছার আলী বর্ণনা করেন, হযরত মাওলানা বশক আলী শাহ্কে মাঘ মাসের শীতের সময় কিছু দুষ্টলোক বলেছিল, তোমাকে তোমার মুর্শিদ বলেছে এই পুকুরের পানির মধ্যে নেমে থাকতে। তিনি তাদের কথামত

পুকুরের পানিতে নামলেন। সন্ধ্যা থেকে সরারাত আকণ্ঠ তিনি পানির মধ্যে ছিলেন। তৎকালীন শীতের সময় মানুষ আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারনের জন্য ছ্যাক নিত। ভোর বেলার মানুষ যখন নামায আদায় করার জন্য পুকুর ঘাটে অজু করতে আসেন তখন সবায় দেখেন সাদা কি যেন পুকুরের মধ্যে ভেসে আছে। তখন তারা সাদা হাঁস মনে করে ঢিল ছুঁড়েন। ঢিলটি তার মাথায় সাদা চুলের উপর পড়ে তারপরও তিনি কোন শব্দ করেননি। জনাব আনছার আলীর জেঠা জিয়া গাজী কী ভেসে আছে দেখার জন্য সামনে দিকে যান, গিয়ে দেখে মওলানা বশৃক আলী শাহ্ পানির মধ্যে ভেসে আছেন। তিনি পানি থেকে হযরত বশৃক আলী (র.) কে তুলে আনেন। কিন্তু হযরত বশৃক আলী মাঘ মাসের শীতের প্রচন্ড ঠান্ডা পানিতে একটু শীত অনুভব করেননি। এভাবে তিনি কঠোর রিয়াজত - সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন।

আল্লাহর অলিগণ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় কিছু লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, তেমনি একটি ঘটনার বর্ণনা করেন, দেবিদ্বার থানার বারুর গ্রাম নিবাসী জনাব মোঃ সায়েদ আলী। তিনি বলেন, হযরত শাহ্সুফি বশৃক আলী শাহ্ (র.) যেদিন ইন্তেকাল করেন ঐদিন আমি আমার শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। রাত তখন প্রায় ১১ টা। আমি যে ঘরে ঘুমিয়েছিলাম ঐ ঘরের দরজায় এসে হযরত বশৃক আলী শাহ্ আমাকে ডেকে বলছেন, "আমি চলে যাচ্ছি সায়েদ আলী, তুমি কি আমার সাথে যাবে? আমর মুর্শিদ আমাকে ডাকছেন"। তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। দরজা খুলে আমি দেখি মওলানা বশৃক আলী শাহ্কে, তখন আমি তাঁর পা আঁকড়িয়ে ধরে কান্না করছিলাম। আমার স্ত্রী আমাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, তুমি এমন করছ কেন? তারপর আমি আর হযরত বশৃক আলী শাহ্ কে দেখতে পেলাম না। রাত যখন প্রভাত হলো তখন আমি শুনতে পেলাম হযরত বশৃক আলী শাহ পৃথিবীতে আর নেই, তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

কঠোর রিয়াজত সাধনা করে ১৮ বছর পর তিনি যখন হযরত গাউসুলআজম মাওলানা শাহ্সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভান্ডারীর (ক.)'র নিকট হাজির হন। তখন হযরত বাবা ভান্ডারী (ক.) বলেন, আমার আলী এসেছে। ঐদিন হযরত বশৃক আলী শাহ্ (র.) তাঁর মুখের জবান খুলেন। মুখের জবান খোলার পর তিনি সদা সর্বদায় পাঠ করতেন, পড় দরুদ ও সালাম আলী ও ফাতেমা হাসান হোসাইন পাইরবির মাজার, আল্লাহ পাক কর দরুদ ও সালাম। মাওলানা বশৃক আলী শাহ্ জীবনে যে ধৈর্য্য পরীক্ষা, কঠোর রিয়াজত সাধনা করেছেন হযরত বাবা ভাণ্ডারী তা কবুল করে নিয়েছেন। আল্লাহ বলছেন, "আমি ধৈর্য্য ধারনকারীর সঙ্গে আছি"।

হযরত গাউসুল আ'যম বিল বিরাসত মাওলানা শাহ্সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবাভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবার এক মুহূর্ত সান্নিধ্যের দ্বারা হযরত শাহ্সুফি বশৃক আলী শাহ্ (র.) অত্যন্ত উচুঁ স্তরের আহলুল্লাহতে উপনীত হয়েছিলেন, যদ্বরা তিনি অসংখ্য কারামত প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং হাজার হাজার নর-নারীকে হেদায়তের আলো দেখিয়েছেন। হযরত মাওলানা শাহ্সুফি বশৃক আলী যে দিন বেলায়তের দীক্ষা নিয়েছিলেন সে দিনটি ছিল ১লা চৈত্র, ঠিক সেই একই দিনে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে হযরত মাওলানা বশৃক আলী শাহ্ ১৯৫০ সালের ১৫ই মার্চ অনন্তধামে শুভযাত্রা করেন। এ উপলক্ষে প্রতি বছর ১লা চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ এবং ১০ই ভাদ্র মহান খোশরোজ শরীফ কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পায়ব দরবার শরীফে উদ্‌যাপিত হয় । আমিন।

তথ্যসূত্র ঃ

হযরত শাহ্সুফি মাওলানা আলিউল গনি মাইজভাণ্ডারী (মান্দাজিলুহুল আলী)
সাজ্জাদানশীন, পায়ব দরবার শরীফ, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

সূফি উদ্ধৃতি

■ যিনি অন্তর চক্ষু দ্বারা আল্লাহর দর্শন লাভ করেন, তার অন্তরে আল্লাহ এমন মারিফাত তত্ত্ব প্রকাশ করেন যা দুনিয়ার আর কারও কাছে প্রকাশ করা হয় না।

■ তাওবা দু'রকম, (ক) "তাওবায়ে আলানিয়াত" বা আমিত্ব ত্যাগের উদ্দেশ্যে তাওবা করা। আর "তাওবায়ে এস্তেজাবাত" অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে লজ্জাবশতঃ তাওবা করা।

–হযরত যুননুন মিসরী (রহঃ)

নবীদের ইতিহাস

ইমাম উদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসির আদ-দামেস্কী (৭০০-৭৭৪ হিজরী)
[মূল আরবী থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ : রাশাদ আহমদ আজমী]
॥ ইংরেজী থেকে বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : ৮৭ কিস্তি)

পঁচিশ অধ্যায়

হযরত ইজরা আলায়হিসসালাম

ইবনে আসাকির বলেন: তাঁর নাম উযায়ের বিন জারওয়াহ। অন্য বর্ণনায়: তিনি হলেন ইবনে সুরিক বিন আদইয়া বিন যব বিন দার্জনা বিন আলি বিন তাকি বিন আসবু বিন পিনেহাস বিন ইলিযার বিন হারুন। আবদুল্লাহ বিন সালাম এর মতে আল্লাহ যে নবীকে একশ বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে পুনরায় জীবিত করেছিলেন তিনি হলেন হযরত উযায়ের (আঃ)।

ইসহাক বিন বিশর হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্যদের বরাত দিয়ে বলেছেন হযরত ইজরা অতিশয় ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। একদা তিনি তাঁর যায়গা জমি দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তিনি এক ধ্বংসোবশেষ এর পাশ দিয়ে আসছিলেন। তখন সময় ছিল দুপুর আর রোদ ছিল প্রখর। তিনি একটি গাধার পিঠে সওয়ার ছিলেন সে অবস্থায়ই ধ্বংস স্তুপে প্রবেশ করেন। একটা ছায়াময় স্থান দেখে তিনি গাধার পিঠ থেকে অবতরণ করেন। তাঁর সাথে ছিল এক বাক্স ডুমুর ও এক ঝুড়ি আঙুর। একটা গামলায় তিনি আঙুরের রস চিপে জমা করেন। এর পর শুকনো রুটি আঙুরের রসে ভিজিয়ে খেতে শুরু করেন। খাওয়া শেষ হলে তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে একটা ভাঙ্গা দেয়ালের দিকে পা মেলে দেন। তিনি ওপরে ছাদের দিকে ও পাশের ধ্বংস স্তুপের দিকে তাকিয়ে বলেন, "আল্লাহ কিভাবে এ মৃত পুরীকে জীবিত করবেন?" (২:২৫৯) এমন নয় যে মৃতকে পুনর্জীবন দানে আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন বরং তিনি স্বাভাবিক মানবীয় কৌতুহল প্রকাশ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাঁর কাছে মৃত্যুর ফিরিশতাকে পাঠান। ফিরিশতা তাঁর প্রাণ হরণ করেন। এরপর একশ বছর পর্যন্ত তিনি মৃত অবস্থায় সেখানে পড়ে থাকেন।

এভাবে একশ বছর কেটে যায়। অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ও নানা পরিবর্তনের মধ্যে ইসরাইলীদের জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ হযরত ইজরা (আঃ) এর কাছে ফিরিশতা পাঠান। ফিরিশতা প্রথমে তাঁর রুহ ফিরিয়ে দেন যাতে তিনি বুঝতে পারেন ও চক্ষু উন্মীলিত করে দেন যাতে তিনি দেখতে পান। এভাবে তিনি দেখতে থাকেন আল্লাহ কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ প্রথমে তাঁর হাড় ও মাংস একত্রিত করেন, হযরত ইজরা (আঃ) স্বচক্ষে তা দেখতে থাকেন। এরপর তাঁর চুল গজায়, শরীরের হাড় মাংস চামড়ায় ঢাকা পড়ে। তাঁর দেহে রুহ সঞ্চারিত হয়। ফিরিশতা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কত সময় ঘুমিয়েছিলে?" তিনি জবাব দিলেন, "সম্ভবত একদিন অথবা তার কিছু অংশ।" বস্তুত তিনি তাই ভেবেছিলেন। কারণ তিনি যখন শুয়েছেন তখন ছিল মধ্যাহ্ন আর যখন জাগরিত হন তখন সূর্য অস্তগামী। ফিরিশতা তাঁকে বললেন, "প্রকৃত পক্ষে তুমি একশ বছর ঘুমিয়েছ। তোমার খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য কর। তোমার শুকনো রুটি ও যে আঙুরের রস নিঙড়িয়ে তুমি গামলায় রেখেছিলে তা এখনো টাটকা রয়েছে। "তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকাও সে গুলো বিনষ্ট হয়নি।" (২:২৫৯)

তাঁর ডুমুর ও আঙুরেরও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সম্ভবত ফিরিশতার কথা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছিল। অতঃপর ফিরিশতা বললেন, "দেখ, তোমার গাধার অবস্থা। তার হাড় ও গোশত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।" এরপর ফিরিশতা গোশতগুলোকে জড়ো হওয়ার নির্দেশ দেন। এতে যেখানে গাধার যত হাড় ইতস্তত ছড়ানো ছিল সব জড়ো হতে থাকে। ফিরিশতা এগুলোকে একত্রিত করে মাংস দিয়ে ঢেকে দেন। তাতে মাংসপেশী জেগে ওঠে। অতঃপর চামড়া গজায় ও তাতে কেশরাজি ফুটে ওঠে। ফিরিশতা এর দেহে ফুঁক দেন। প্রাণ ফিরে পেয়ে গাধাটি হযরত ইজরা (আঃ) এর সামনে দাঁড়িয়ে যায়।

তিনি গাধায় আরোহন করে লোকালয়ে ফিরে আসেন। পরিচিত কাউকে তিনি পেলেন না। তাঁকেও কেউ চিনতে পারলনা। সন্দিগ্ধ অবস্থায় তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে গেলেন। তিনি সেখানে এক বৃদ্ধা মহিলাকে পেলেন যিনি অন্ধ ও চলৎশক্তি রহিতা। তাঁর বয়স একশ বিশ বছর। এ মহিলা ছিলেন তাঁদের ঘরের চাকরানী। হযরত ইজরা (আঃ) গৃহ ত্যাগের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: 'এ বাড়ি কি ইজরার?' মহিলা বললেন, "হ্যাঁ এ বাড়ি ইজরার।" বলেই মহিলা কাঁদতে শুরু করলেন। আর বললেন, "বহু বছর ধরে আমি এমন কাউকে দেখিনি যে ইজরাকে চেনে। লোকজন তাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।" তিনি বললেন, "আমিই ইজরা। একশ বছর পূর্বে আল্লাহ আমার মৃত্যু ঘটিয়েছেন। এখন আমাকে আবার জীবন দান করেছেন।" মহিলা বললেন, "আমরা আজ একশ বছর হল তাঁকে হারিয়ে ফেলেছি, এ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে আমরা আর কিছুই জানতে পারিনি। তিনি বললেন: 'আমিই ইজরা।' মহিলা বললেন, তাহলে আমি বলছি, শুনুন আমাদের ইজরা এমন মানুষ ছিলেন যাঁর প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করতেন। তিনি রোগীর নিরাময় করতে পারতেন, কেউ অসুস্থ হলে তিনি দোয়া করতেন আর সে ভালো হয়ে যেত। আপনি ইজরা হলে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যাতে তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন যাতে আমি আপনাকে দেখতে পারি। তখন ইজরা হলে আমি আপনাকে চিনতে পারব।" (চলবে)

উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানার স্থানান্তরিত আসন বন্টন

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলাধীন মাইজভাণ্ডার শরীফস্থ গাউসিয়া হক মন্‌জিলের আওতাধীন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানার নতুন ভবনে স্থানান্তরিত আসন বিন্যাস অনুষ্ঠান গত ১৮ মে শুক্রবার বিকাল ৫টায় প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপদেষ্টা গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম আলম আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ)। এ উপলক্ষে প্রত্যেক নিবাসীকে নতুন একটি করে বেডিং, বেডশীট, বালিশ, কম্বল, মশারী, গেঞ্জি ও পাঞ্জাবী দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত, নাত-এ-রাসূল (দঃ) ও মাইজভাণ্ডারী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন এম মাকসুদুর রহমান হাসনু। উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী কমিটির সহ সভাপতি হাজী মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন, শরীফ উদ্দিন মাহমুদ, কামরুল হাসান চৌধুরী খোকন, কাজী মোঃ ইউছুপ, শেখ নুরুল আমিন শাহ (কালু শাহ), এম শওকত হোসাইন, শেখ মুজিবুর রহমান বাবুল, নজরুল ইসলাম চৌধুরী ও অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ। আরো উপস্থিত ছিলেন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি কেন্দ্রীয় পর্ষদ বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমদ সিকদার, বিভিন্ন শাখা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকসহ কর্মকর্তাবৃন্দ, নিবাসীদের অভিভাবক, গাউসিয়া হক মন্‌জিলের কর্মকর্তাবৃন্দ, মাসিক আলোকধারাসহ মিডিয়ার সাংবাদিক ও আশেকে হক ভাণ্ডারীগণ। পরিশেষে মিলাদ, দুরুদ, সালামে গাউছিয়ার পর দেশ, জাতি ও প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, উন্নতি ও শান্তি কামনা করে মুনাজাত করেন রাহবারে আলম আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ)।

গাউসিয়া হক কমিটি হাইদচকিয়া শাখার কার্যকরী কমিটির বার্ষিক সভা

গত ১মে ২০১২ইং রোজ মঙ্গলবার ফটিকছড়ি হাইদচকিয়ায় মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ সূর্যগিরি আশ্রম শাখার কার্যকরী কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা সভাপতি ডা. বরুণ কুমার আচার্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পর্ষদের চেয়ারম্যান, জামাম গ্রুপের পরিচালক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সি.আই.পি ও দুবাই বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব আলমগীর জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মাজিম ও আশ্রমের উপদেষ্টা বাবু তরুণ কুমার আচার্য্য। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব অলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (ক.) মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র রওজা শরীফের খাদেম মাওলানা লোকমান হোসাইন।

সভায় গত এক বছরের কার্য বিবরণীর উপর সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর অর্থ সম্পাদকের প্রতিবেদন এবং সাংগঠনিক সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করা হয়। বক্তারা বলেন- প্রত্যেক ধর্মের লোকজন তার নিজস্ব ধর্মীয় বিধি বিধান অনুযায়ী স্রষ্টাকে স্মরণ করে, সবার মূলে হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বৈষম্য ভুলে সবাইকে মিলে মিশে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের মাধ্যমে সমাজ, জাতি ও দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে হবে। মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির যে মহান দায়িত্ব সূর্যগিরি আশ্রম শাখার উপর ন্যস্ত আছে, তা যেন তারা সঠিকভাবে পালন করতে পারে। বক্তাগন সূর্যগিরি আশ্রমের যাবতীয় সামাজিক কর্মকান্ড যথা- স্বেচ্ছায় রক্তদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, পাঠ্যবই ও পাঠ্যসামগ্রী বিতরণ, পবিত্র রমজান মাসে দরিদ্রদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণসহ যাবতীয় কর্মসূচী পরিচালনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এইসব সামাজিক কর্মকান্ডে সমাজের প্রত্যেক মানুষের এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করেন। সমাজ ও সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য সূর্যগিরি আশ্রম শাখা যে কর্মকান্ড সমূহ গ্রহণ করেছে তা যেন সম্পন্ন করতে পারে তার জন্য সকলের সহযোগীতা চেয়ে এবং আশ্রমের সকল সদস্যের আত্মিক উন্নতির জন্য বিশ্বঅলি হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (ক.) মাইজভাণ্ডারীর দরবারে দোয়া কামনা করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন টিটু চৌধুরী ও মাইকেল দে, ছোটন দে, অনুপম তালুকদার, ধীমান দাশ, প্রিন্স দাশ, বিষ্ণু চৌধুরী, কৃষ্ণ বৈদ্য, গৌরাঙ্গ দত্ত, উত্তম দাশ, সুপ্লব দত্ত, মানিক বড়ুয়া, নন্দিতা দাশ, সোমা গুহ, আলো বড়ুয়া, অমর শর্মা প্রমুখ।

গাউসিয়া হক কমিটির বিভিন্ন শাখার মিলাদ মাহফিল

মুগরাকান্দা : গত ১মে বাদ আসর মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি সান্ডার মুগরাকান্দায় এক নূরানী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মঃ জিঃআঃ), এতে ঢাকার আশে পাশের কমিটি সমূহের সদস্যসহ ভক্তবৃন্দসহ অনেক গন্যমান্য ব্যক্তি ও বিপুল সংখ্যক আশেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। মাহফিলে তকরির করেন জনাব মৌলানা আবদুস সাত্তার, জনাব মৌলানা এনাম রেজা আলকাদেরী, হবিগঞ্জ, জনাব মৌলানা শফিকুল ইসলাম, সিলেট এবং সর্বশেষে মওলা হুজুর মুনাজাত পরিচালনা করেন এবং দেশ ও জাতির সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন।

ঢাকা খানকা : গত ২মে বাদ আসর হেমায়েতপুরস্থ ঢাকা খানকায় হলমার্ক গ্রুপের উদ্যোগে এক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন

রাহবারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মাঃজিঃআঃ), হলমার্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তানভীর মাহমুদ, ও টি এন্ড টির জনাব এনায়েতুর রহমান। এতে ঢাকা সংলগ্ন আশে পাশের কমিটি সমূহের সদস্যসহ ভক্তবৃন্দ, অনেক গন্যমান্য ব্যাক্তি ও বিপুল সংখ্যক আশেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। মাহফিল পরিচালনা করেন ঢাকাস্থ খাদকার সদস্য জনাব মৌলানা আবদুস সাত্তার ও জনাব মৌলানা শফিকুল ইসলাম, সিলেট সর্বশেষে

মওলা হুজুর মুনাজাত পরিচালনা করেন এবং দেশ ও জাতির সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন। পরিশেষে জিকির মাহফিল পরিচালনা করেন জনাব জাবের সরওয়ার।

নারায়নগঞ্জে মুড়াপাড়া : গত ৩ মে বাদ আসর নারায়নগঞ্জে মুড়াপাড়া মাইজভাণ্ডারী গাউছিয়া হক কমিটির উদ্যোগে এক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মাঃজিঃআঃ), এতে ঢাকার আশে পাশের কমিটি সমূহের সদস্যসহ ভক্তবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক আশেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। মাহফিলে তকরির করেন জনাব হাফেজ মৌলানা আল মামুন, জনাব মৌলানা শফিকুল ইসলাম, সিলেট এবং সর্বশেষে মওলা হুজুর মুনাজাত পরিচালনা করেন এবং দেশ ও জাতির সুখ সমৃদ্ধিও কল্যাণ কামনা করেন।

সংযুক্ত আরব আমিরতের আজমানে দোয়া মাহফিল

বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহসূফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী গাউসিয়া হক মনজিলের বর্তমান সাজ্জাদানশীন হজরতুলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মাঃজিঃআঃ) সংযুক্ত আরব আমিরাত আজমান এ শুভাগমন উপলক্ষ্যে এক বিশাল সংবর্ধনা সভা ও দোয়া মাহফিল ১৯ মে ২০১২ শনিবার স্থানীয় আল রাইয়ান হোটেলে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি আজমানের প্রধান উপদেষ্টা জনাব মাওলানা দিদারুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাহবারে আলম হযরতুলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মাঃজিঃআঃ) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ড. রাজা সাজ্জাদ হোসেন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের (আজমান) ইসলামী ষ্টডিজ বিভাগের প্রধান ড. ওয়াসিম আহমদ, ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউ.এস.এ) চৌধুরী মোহাম্মদ ইউসুফ। সেলিম উদ্দিন চৌধুরীর উপস্থাপনায় মোঃ আবু আব্দুল্লাহ বাকের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নাতে রাসূল (দঃ) পরিবেশন করেন। এতে মাইজভাণ্ডারী মরমী সংগীত পরিবেশন করেন আবু আবদুল্লাহ মোঃ জাবের। বক্তব্য রাখেন তহবিল পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব জনাব আবদুল বাতেন। মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি আজমান শাখার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন হিরো। সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা মহিউদ্দিন সাদেক। উপস্থিত ছিলেন আব্দুল আলিম, জিল্লুর রহমান, মোঃ মহিউদ্দিন মহিম, মোঃ ওসমান, মোঃ মোসলেহ উদ্দিন, আবুল কাসেম, মোঃ আলী, মামুন সরকার, এমদাদ সওদাগর। দিদারুল আলম, আব্দুল মালেক, আবুল বশর, ফিরোজ আলম, খোরশেদ আলম, শাহজাদ, ওসমানসহ হাজার হাজার আশেক ভক্ত-অনুরক্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বিশ্ব মুসলিমদের মধ্যে আজ অশান্তি হানাহানি, মানুষের মাঝে অবক্ষয় বিরাজ করছে। এই হানাহানি ও অবক্ষয় থেকে মুক্তি পেতে মাইজভাণ্ডারী শান্তি ও সংস্কৃতির নীতি অনুসরণের উপর আমাদের জোর দিতে হবে। এ দর্শনের প্রবর্তক গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সপ্ত পদ্ধতি মোতাবেক ও বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত

মাওলানা সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র আদর্শের, মাইজভাণ্ডারী মাশায়েখে কেরামের নির্দেশিত এই শান্তি, প্রেম ও ঐক্যের নীতি গ্রহণ করলে আমরা নিঃসন্দেহে নাজাতের ও শান্তির জীবন গড়তে পারব।

ওমানে সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর সম্মানে শেখ রেহেমা বিনতে খামিজ ও শেখ আব্দুল্লাহ বিন রাশেদ আল কাইয়ুম এর বাসভবনে প্রীতিভোজ

মওলা হুজুর সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর (মাঃজিঃআঃ) সম্মানে ওমানের আল কাবুরাস্থ শেখ রেহেমা বিনতে খামিজ ও শেখ আব্দুল্লাহ বিন রাশেদ আল কাইয়ুম তাঁদের বাসভবনে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করেন এবং মওলা হুজুরের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হয়ে তাঁদের পরিবারের জন্য এবং সালতানাত অফ ওমানবাসীর জন্য দোয়া কামনা করেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব নুরুল আলম চৌধুরী। গাউসিয়া হক কমিটি ১নং শাখার সভাপতি কাজী রোস্তম, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল হক, সৈয়দ নজরুল, মোঃ মুজিব, দিদারুল আলম ভাণ্ডারী, ইঞ্জিনিয়ার জে.কে. ছোটন, মোঃ শহীদ, মোঃ সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, মোঃ শাহজাহান এবং ২নং শাখার সভাপতি সিরাজুল হক।

শাহানশাহ বাবাজানের আস্তানা শরীফে ওরশ শরীফ

আগামী ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৮ জুন ২০১২ ইংরেজী, ১৭ রজব শুক্রবার বিশ্বঅলি শাহানশাহ বাবাজানের আস্তানা শরীফের উদ্যোগে আতায়ে রাসূল গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতি হাছান সাঞ্জারী আজমীরীর ওরশ শরীফ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত ওরশ শরীফে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের দাওয়াত।

শারজায় সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে জীবন গড়াই প্রকৃত মুসলমানের কাজ

সংযুক্ত আরব আমিরাত গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ শারজা ও রোলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সংবর্ধনা ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ)।

আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশিত পথে চলাই প্রকৃত মুমিনের কাজ। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ মোতাবেক চলে না সেই ব্যক্তি বিপথগামী হয়। পরকালের শান্তি নিশ্চিত করতে হলে কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক চলতে হবে। গত ২৩ মে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ -এর সংযুক্ত আরব আমিরাতস্থ বিভিন্ন শাখা কমিটিসহ সংযুক্ত আরব আমিরাত মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ শারজা রোলা শাখার উদ্যোগে এশিয়ান প্যালেস হোটেল হলরুমে আয়োজিত সংবর্ধনা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। গাউসিয়া হক কমিটি শারজাহ্ শাখার সভাপতি প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ রোলা শাখার সভাপতি আবদুস সবুর, জাহেদুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম তালুকদার সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পবিত্র সেমা মাহফিল শেষে মুসলিম উম্মাহ্‌র সুখ-শান্তি কামনা করে সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী বিশেষ মোনাজাত করেন।

আবুধাবী গাউসিয়া হক কমিটির উদ্যোগে সংবর্ধনা ও মিলাদ মাহফিল

আমাদের নামে মুসলমান হলে চলবে না। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে জীবন গড়াই একজন মুসলমানের কাজ। আল্লাহ্-রাসুলের নির্দেশিত পথে না চলার কারণে সারা বিশ্বে মুসলমানরা আজ নির্যাতিত হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত আবুধাবী মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় একটি হোটেল আয়োজিত সংবর্ধনা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ ইউনুচ এর সভাপতিত্বে সভায় গাউসিয়া হক কমিটির আবুধাবী, শারজাহ্, আল-আইন, আজমানের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। মাহফিল শেষে মুসলিম উম্মাহ্‌র সুখ-শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

দুবাই আবির গাউসিয়া হক কমিটির মিলাদ মাহফিল

আল্লাহ্ ও রাসুলের নির্দেশিত পথে চলাই প্রকৃত মুসলমানের কাজ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসুলের আদেশ মোতাবেক চলে না সেই ব্যক্তি বিপথগামী হয়। পরকালে শান্তি নিশ্চিত করতে হলে কুরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক চলতে হবে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত আবির মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি আয়োজিত মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শফির সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের মহাসচিব মোহাম্মদ বখতিয়ার, মাহাবুবুল আলমসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শেষে মুসলিম উম্মাহ্‌র সুখ-শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

রাষ্ট্রদূত নুরুল আলম চৌধুরীর আমন্ত্রণে মওলা হুজুরের ওমান দূতাবাসে উপস্থিতি

সালতানাত অফ ওমানে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব নূরুল আলম চৌধুরীর আমন্ত্রণে মওলা হুজুর হযরত আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মাঃজিঃআঃ) বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে রাষ্ট্রদূতের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। এতে রাষ্ট্রদূত মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারীর প্রতি ওমানে আসার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রদূত মহোদয় ওমানে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য মওলা হুজুরের দোয়া কামনা করেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি ওমান ১নং শাখার সভাপতি কাজী রোস্তম, সিরাজুল হক, সৈয়দ নজরুল, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ইঞ্জিনিয়ার জে.কে. ছোটন, আব্দুল মান্নান, মোঃ মজিদ, মোঃ কামাল, মোঃ শাহজাহান, মোঃ আব্দুল মাবুদ, মোঃ সৈয়দ, আবুল হোসেন, ওয়াদি আল কবির ২নং শাখার সভাপতি সিরাজুল হক, এস.এম. আকবর, আমিনুল হক প্রমূখ।

গাউসিয়া হক কমিটি কেন্দ্রীয় পর্ষদের সভা

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্ষদের এক সভা গত ২৫ মে মাইজভাণ্ডার শরীফ গাউসিয়া হক মনজিলের শান্তিকুঞ্জে জনাব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন এ ওয়াই এম জাফর, জামাল আহমদ সিকদার, কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ, মুহাম্মদ ইসমাইল, আবদুল্লাহ আল মামুন, মুহাম্মদ অলিউল্লাহ প্রমূখ। সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রমের উপর আলোচনা ও সদ্য সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানে রাহবারে আলম আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর সফর সুন্দর ভাবে সমাপ্ত করায় সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমানের গাউসিয়া হক কমিটির কর্মকর্তা ও ওমান রাষ্ট্রদূত নুরুল আলম চৌধুরীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৬ জুন শাহানশাহ বাবাজানের আম্মাজানের ফাতেহা

আগামী ৬ জুন ২০১২ ইংরেজী, ২৩ জ্যৈষ্ঠ অছি-এ-গাউসুল আ'যম শাহসূফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র সহ-ধর্মিনী ও বিশ্ব অলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র শ্রদ্ধেয় আম্মাজান সৈয়দা সাজেদা খাতুন (রঃ)'র ফাতেহা শরীফ মাইজভাণ্ডার শরীফ গাউসিয়া হক মনজিলে অনুষ্ঠিত হবে।

ওমানে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ) আল্লাহর অলিদের দরবারের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রেখে আমাদের নৈতিক চরিত্র, আধ্যাত্মিক চেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে লালন পালন করতে হবে

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ এমন একটি ঐতিহ্য যেটি এখান থেকে (আরব অঞ্চল) হাজার হাজার মাইল দুরে বিকশিত হয়েছে, লালিত হয়েছে, যে ঐতিহ্য এই অঞ্চল থেকে গিয়ে তথা মক্কাতুল মোকাররমা, মদিনাতুল মোনাওয়ারা হয়ে একই ঐতিহ্য মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে বিকশিত হয়েছে। মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ ওমান ১নং শাখা কর্তৃক হোটেল ডেলমনের পার্টি হলে আয়োজিত আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাইজভাণ্ডার গাউসিয়া হক মঞ্জিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মাঃজিঃআঃ) উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি পবিত্র কুরআনে করিমের আলোকে বর্ণনা করেন- আল্লাহর রহমত তাঁর প্রিয় বান্দা তথা আউলিয়ায়ে কামেলীনদের নিকট তোমরা পাবে। প্রবাসী বাংলাদেশী ভাইদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রত্যেকে এক একজন রাষ্ট্রদূত। সবাইকে ওমানের আইন কানুন মেনে চলতে হবে। কোন দু:খজনক ঘটনার যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দেশের সুনাম যাতে বজায় থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পরিশ্রমের মাধ্যমে নিরাপত্তার সাথে, সমৃদ্ধির সাথে উত্তর একটি ভবিষ্যত তৈরি করার জন্য সবাইকে আহবান জানান। মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি ওমান ১নং শাখার সভাপতি কাজী রোস্তম এর সভাপতিত্বে এবং ইঞ্জিনিয়ার জে.কে. ছোটনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আরো আলোচনা করেন সভার বিশেষ অতিথি ওমানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মান্যবর জনাব নুরুল আলম চৌধুরী। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ ওমান ১নং শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল হক। আরো বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, সৈয়দ নজরুল, দিদার ভাণ্ডারী, এস.এম. আকবর, মোহাম্মদ সৈয়দ, মো: এসকান্দর, মৌলানা মো: দিদারুল আলম, মৌলানা মো: হোসাইন নূরী, মো: মুজিব, মো: মান্নান, মো: আবুল হোসেন, মো: শাহজাহান। মিলাদ ও কিয়াম পরিচালনা করেন মৌলানা মোহাম্মদ খায়রুল বশর।

শোকবার্তা

মোহাম্মদ ওসমান গণির ইন্তেকালে শোক : আশেকানে গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী নাজিরহাট শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও চট্টগ্রাম কাওয়ালি শিল্পী গোষ্ঠির সহ-সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ আবু ছালেহ এর আব্বাজান মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ ওসমান গণি গত ১ মে, ২০১২ ইং মঙ্গলবার সকাল ১১:৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম শহরস্থ বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি---রাজেউন)। ঐ দিন বাদে মাগরিব চট্টগ্রাম হাটহাজারী ধলই ইউনিয়নের সোনাইরকুল মিয়াজী মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা শেষে হযরত শাহসূফি সৈয়দ মাওলানা সৈয়দ আহমদ শাহ (রহঃ) মাজার শরীফের পার্শ্বে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুমের মৃত্যুতে আশেকানে গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী নাজিরহাট শাখা, আজাদী বাজার শাখা, নানুপুর শাখা, গোপাল ঘাটা শাখা, রোসাংগিরী শাখা, বিবিরহাট (ফটিকছড়ি) শাখা, মন্দকিনী শাখা, ধলই শাখা, মির্জাপুর শাখা সহ বিভিন্ন শাখার পক্ষে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

মোহছেনা বেগমের ইন্তেকালে শোক : খলিফা-এ-গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হযরত শাহসূফি নবীদর রহমান শাহ্ (রঃ)'র ভাতুষ্পুত্রবধু আশেকানে গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী নানুপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক মামুন'র নানীজান মোহছেনা বেগম (৯০) গত ১৪.৫.১২ সোমবার রাত ৮টা ৫ মিনিটের সময় নিজ বাস ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, (ইন্নালিল্লাহি---রাজেউন), তিনি ৩ পুত্র ৭ মেয়ে সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান, তাঁর মৃত্যুতে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, আশেকানে গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী নাজিরহাট, ধলই, শাহ চৌমুহনী, গোপালঘাটা, আজাদী বাজার, বক্তপুর ও নানুপুর শাখা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের পক্ষ হতে গভীর সমবেদনা জানানো হয় ও মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। পরদিন বিকাল ৩টার সময় নানুপুর গাউসিয়া মাদ্রাসা মাঠে নামাযে জানাযা শেষে মরহুমার দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়।

মোহাম্মদ বেলাল হোসেন : ফটিকছড়ি হাইদচকিয়া মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি সুর্যগিরি আশ্রম শাখার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ বেলাল হোসেন (দুলাল) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২১ মে সকাল ৭টায় ২৫নং সার্জিক্যাল ওয়ার্ড ৫নং সিট থেকে হৃদ যন্ত্র বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহি---রাজেউন) মৃত্যুকালে তাহার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। ৪ মেয়ে ও ১ সন্তান এবং স্ত্রীসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখেযান। তাহার আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি সুর্যগিরি আশ্রম শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রী বরুন কুমার আচার্য্য (বলাই)। এছাড়া মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি হারুয়ালছড়ি -১ ও ২, আশেকানে গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী বিবিরহাট, পাইন্দং ও ছিলনিয়া শাখার সভাপতি মোহাম্মদ হাফেজ আবুল কাসেম এবং হারুয়ালছড়ি শাখার সভাপতি জনাব শাহেদ আলী চৌধুরী গভীর শোক প্রকাশ করেন।

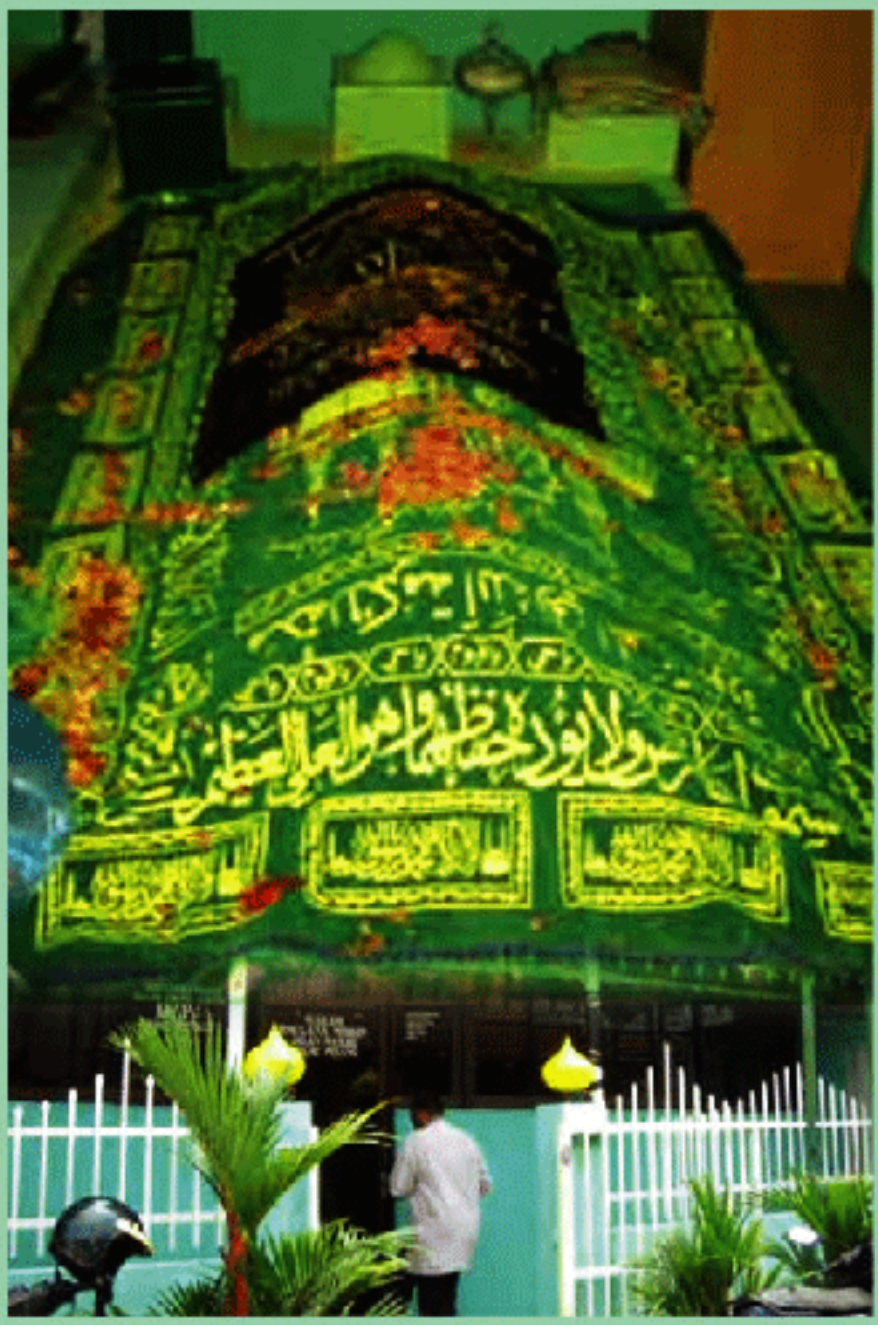

হযরত সৈয়দ ছহুল হামিদ (রঃ)-এর রওজা শরীফ জেয়ারতের দৃশ্য।

THE MONTHLY ALOKDHARA REGD. NO CHA - 272 PRICE - 15.00

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

স্থাপত্য প্রকল্প :

১. শাপলা নক্শা শোভিত রওজা শরীফ।
২. বাব-এ-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী তোরণ (নাজিরহাট দরবার গেইট)।

শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প :

১. মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী।
২. উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম হেফজখানা ও এতিমখানা।
৩. শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক) বৃত্তি তহবিল।
৪. মাইজভাণ্ডার শরীফ গণপাঠাগার।
৫. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি।
৬. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি।
৭. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া।
৮. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী এবতেদায়ী কে. জি. মাদ্‌রাসা, পশ্চিম গোমদন্ডী, বোয়ালখালী।
৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী।
১০. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী।
১১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ (সদর)।
১২. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী স্কুল, শান্তির দ্বীপ গহিরা, রাউজান।
১৩. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী এবতেদায়ী ও হেফজখানা, হামজারবাগ, চট্টগ্রাম।
১৪. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৫. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, এয়াকুবদণ্ডী পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬. মাদ্‌রাসা-এ-বিশ্বঅলি শাহনশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হেফজখানা ও এতিমখানা, মনোহরদী, নরসিংদী
১৭. জিয়াউল কুরআন ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও এবাদতখানা, চরখিজিরপুর (টেক্সঘর) বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৮. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প :

১. হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প :

১. মূলধারা সমাজকল্যাণ সমিতি (রেজিঃ নং-চট্টগ্রাম ২৪৬৮/০২)।
২. প্রত্যাশা সঞ্চয় প্রকল্প।
৩. যাকাত তহবিল।
৪. দুস্থ সাহায্য তহবিল।

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প :

১. মাসিক আলোকধারা।
২. মাইজভাণ্ডারী একাডেমী।

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প :

১. মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
২. মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প :

১. নাজিরহাট তেমোহনী রাস্তার মাথায় যাত্রী ছাউনী ও এবাদতখানা।
২. শানে আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন যাত্রী ছাউনী।
৩. ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।